নেতাজী

(নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনোপন্যাস)

গোপাল ভৌমিক



শ্রী পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা

প্রকাশক : দিলীপকুমার বোস
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

নেতাজী

প্রথম প্রকাশ * * * আষাঢ় ১৩৫৩

দাম—দুই টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীপুলিনবিহারী সামন্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নেতাজী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত মনীষীনাথ ঘোষ

শ্রীচরণকমলেষু—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। ব্রহ্মরণাঙ্গণে তাঁর সামরিক কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হবার পর তাঁর সম্বন্ধে এরই মধ্যে বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। তিনি পরাধীন ভারতের যে মুক্তি-পথের সন্ধান দিয়েছেন, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া স্বাধীনতাকামী ভারতীয় মাত্রেরই কর্তব্য। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—নেতাজী সম্বন্ধীয় এত পুস্তক থাকতে আমি আবার নতুন গ্রন্থ রচনা করতে গেলাম কোন দুঃসাহসে? তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে বাংলা ভাষায় নেতাজী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত বই বেরিয়েছে, তার কোন খানির মধ্যেই আমি সুভাষচন্দ্রের আনুপূর্বিক পূর্ণাঙ্গ জীবন, তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এবং জীবন-দর্শনের সন্ধান পাই নি। অথচ পাঠক-পাঠিকা সমাজে এরকম একখানি বইয়ের চাহিদা আছে বলে আমার মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থে আমি এই অভাব পূরণ করারই প্রয়াস পেয়েছি। আমি বহু ইংরেজী, বাংলা গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র এবং সাময়িক পত্রাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প আয়তনের মধ্যে নেতাজীর একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ জীবনী রচনার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে যাঁর প্রেরণা সব চেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে তিনি শ্রী পাবলিশিং কোম্পানির কর্ণধার বন্ধুবর শ্রীদিলীপকুমার বোস। তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকলে এ গ্রন্থ রচনা করা হয়ত হয়েই উঠত না।
নেতাজীর সমগ্র জীবন-কথা জানতে উৎসুক—বাংলার এমন অগণিত পাঠক পাঠিকাদের জন্যেই আমার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। তাঁদের তৃপ্তি বিধান করতে পারলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

গোপাল ভৌমিক



নেতাজী

বাল্য ও কৈশোর

মহাত্মাজী বলতে যেমন সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝায়, নেতাজী বলতেও আজ তেমনই সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র লোককেই বোঝায়। মহাত্মাজী ও নেতাজী—পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুটি বিরাট স্তম্ভ বিশেষ। এঁদের দুজনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ ও মত ভিন্ন—কিন্তু লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। দুজনেরই জীবনের মূলমন্ত্র পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা, নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবাসীর বৈদেশিক শোষণ-মুক্তি। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করে গান্ধীজী সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক নতুন আদর্শ সংস্থাপন করেছেন। তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি আধ্যাত্মিকতার শিক্ষক, নতুন জীবন-বেদ ও দর্শনের উদ্গাতা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের দিক মাত্র একটি—তিনি পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। ভারতকে দাসত্বের থেকে উদ্ধার করা ছিল তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের ধ্যান, সমগ্র জীবনের ঐকান্তিক সাধনা। গান্ধীজীর মত নিজের দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনা হয়ত তাঁর জীবনের ব্রত নয়। তাই তিনি দার্শনিক চিন্তায় কালক্ষেপ করতে পারেন নি কিংবা স্বাধীনতা লাভের একমাত্র অস্ত্র হিসাবে অহিংসাকেও গ্রহণ করতে পারেন নি।

রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাজী তাই চরম বিপ্লবী—ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তিনি যে কোন পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত।

গান্ধীজীকে যদি বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিকদের সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়, তবে নেতাজীকেও গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, ওয়াশিংটন, ডিভ্যালেরা, লেনিন প্রভৃতি বিশ্বের দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করতে হয়। বরং কোন কোন বিষয়ে নেতাজী এঁদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা জীবনে যে সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলেন, নেতাজী সেই সব সুযোগ সুবিধা পেলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত করতে পারতেন। সাফল্যই সব কিছু নয়—প্রচেষ্টার মূল্যও কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নয়। একবার ভাবুন'ত দেখি নিরস্ত্র নিরীহ একটি বাঙ্গালী সন্তান আজাদ হিন্দ্ গবর্ণমেণ্ট গঠন করে এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মত সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী তৈরী করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপুল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে আসে নাকি? তা ছাড়া সময়ই বা কত অল্প! ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডী বা ডিভ্যালেরা মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাঁদের মুক্তি-ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন। আর নেতাজী মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মহান কীর্তি বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও, যাঁরা এঁর সংগঠক ও পরিচালক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জানেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর পক্ষে এরূপ কৃতিত্ব আদৌ অসম্ভব নয়।

জন্ম-বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মত কর্মমুখর ঘটনা-বহুল জীবন আর কোন ভারতীয় নেতার আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যেন রূপকথার রাজপুত্র

—দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকুমারীকে উদ্ধার করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। বন্দিনী রাজকুমারী এখানে দুঃখিনী ভারতমাতা—তিনি মুক্তি চান ব্রিটিশদের হাত থেকে। সুভাষচন্দ্র জীবনের প্রথমেই মায়ের এই ব্যাকুল আহ্বান শুনেছিলেন এবং সেই থেকে পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধনাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তিনি জীবনের সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন বিসর্জন, রাজরোষ, কারাজীবন, নির্বাসন কিছুই তাঁকে ব্রতচ্যুত করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত সেই প্রেরণায় তিনি চরম দুঃখ বরণ করে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা রূপ-কথারই মত চমকপ্রদ—বিস্ময়কর। তাঁর জীবনকথা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলেও, এটা তাঁর জীবনের কোন একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। জীবনে তিনি যে চরম বিপ্লবী রাজনীতির ধারক ও পোষক ছিলেন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তারই মূর্ত বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

২৩শে জানুয়ারী তারিখটি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এই তারিখটিতে কটক-প্রবাসী একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী কায়স্থ পরিবারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু এবং মাতার নাম ছিল প্রভাবতী দেবী। তাঁদের পৈতৃক গৃহ ছিল ২৪ পরগণা জেলায় কোদালিয়া গ্রামে। জানকীবাবু আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসায়-সূত্রেই কটকে বসবাস করতেন। তিনি সে সময় কটকের সরকারী উকিলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময় কটকে

তাঁর মত প্রতিষ্ঠাবান উকিল আর ছিল না। তিনি কটক বারের সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া, কটকের জনসমাজেও তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্ত ছিল না। এই জনপ্রিয়তার জন্যেই জানকীনাথ বেশ কিছুকাল কটক মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওদিকে স্বকার্যে কৃতিত্বের জন্যে রাজদরবারেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। এই প্রতিষ্ঠার প্রমাণ তাঁর সরকারী রায়বাহাদুর খেতাব লাভ। কিন্তু সরকারী খেতাব লাভ করেছিলেন বলেই জানকীনাথের অন্তরে স্বদেশপ্রেম ছিল না মনে করলে ভুল করা হবে। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে আমরা জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেমের যে বিরাট মহীরুহ দেখতে পাই, তার বীজ নিহিত ছিল পিতারই চরিত্রে। আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্যে গবর্ণমেণ্ট যখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তার প্রতিবাদে জানকীনাথ সরকারী রায়-বাহাদুর খেতাব ত্যাগ করে নিজের দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

পিতার চরিত্র যেমন সুভাষচন্দ্রকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল, মাতার আদর্শ ধর্মনিষ্ঠ চরিত্র তেমনি তাঁর মনে এনে দিয়েছিল কোমলতা, ধর্মনিষ্ঠা। প্রভাবতী দেবী তাঁর পরিবারে 'মা-জননী' নামে পরিচিতা ছিলেন। সমস্ত পুত্রকন্যার মধ্যে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন তাঁর চোখের মণি। সুভাষচন্দ্রও মাকে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে ভালবাসতেন। মার পরদুঃখকাতরতা অতি শৈশব থেকে পুত্রের চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র পিতামাতার ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর অন্যান্য সব ভাইও জীবনে কৃতবিদ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রিয় মেজদাদা শ্রীযুক্ত

শরৎচন্দ্র বসু প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এবং বর্তমানে বাঙ্গলার অবিসম্বাদী নেতা। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মজীবনে শরৎচন্দ্রের নীরব অকুণ্ঠ দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই আন্তরিক অকৃত্রিম যোগাযোগ বাল্যের থেকেই গভীর ছিল। পরিবারের অন্য একটি লোকের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের শৈশব থেকেই গভীর হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল। এঁর নাম সারদা—ইনি ছিলেন বসু পরিবারের পরিচারিকা, আশৈশব সুভাষচন্দ্রের দাই-মা। এই অশিক্ষিতা পরিচারিকা অন্তরের স্নেহ উজাড় করে দিয়ে ছোট থেকে সুভাষচন্দ্রকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের যত কিছু স্নেহের অত্যাচার আবদার সব কিছু চলত সারদার উপরে। তিনি সস্নেহে সুভাষচন্দ্রের সব আবদারই রক্ষা করে চলতেন। সুভাষচন্দ্রও এঁকে মায়ের মতই ভক্তি করতেন। ইনি আমৃত্যু বসু পরিবারেই ছিলেন। সুভাষচন্দ্র জীবনে কোনদিন অর্থোপার্জন করলেন না, বিবাহাদি করে সংসারধর্ম পালন করলেন না—এতে সারদা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মত অশিক্ষিতা পরিচারিকার পক্ষে সুভাষচন্দ্রের জীবনের মহৎ ব্রত বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে একদিনও সুভাষচন্দ্রের উপর থেকে তাঁর স্নেহদৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি! একদিন কে যেন সারদাকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি সুভাষচন্দ্রের মোটরে যাচ্ছেন কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে সারদা আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন: "সুভাষ আবার মোটর গাড়ী পাবে কোথায়? সে ত জীবনে কিছু রোজগারই করল না। হায়! ও আর মানুষ হবে না!" ১৯৪১ সালে সুভাষের গৃহত্যাগের পর স্নেহশীলা পরিচারিকার হৃদয় যেন ভেঙে পড়েছিল। এই ঘটনার এক বছরের

মধ্যেই তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। এর এক বৎসর পরে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্রের স্নেহময়ী জননী প্রভাবতী দেবীও পুত্রের দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন। আর তাঁর প্রিয় পুত্র পরাধীন ভারতের প্রিয়তম নেতাজী বন্দিনী দেশমাতৃকার পায়ের শিকল খোলার সাধনায় তখন ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলছেন।

বালক বয়স থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ আর দশজন ছেলের মত তাঁর জীবনযাত্রা ছিল না। তিনি তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নেহাৎ ভাল ছেলের মত সব সময় পড়াশুনো করা তিনি ভালবাসতেন না। পরের দুঃখ মোচন, রোগীদের সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতির দিকে তাঁর প্রথম থেকেই ঝোঁক দেখা যায়। তা ছাড়া অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে ধর্মভাবের বিকাশ দেখা যায়। তাঁর ছাত্রজীবনের হাতে খড়ি হয় কটকের প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয় স্কুলে। সুভাষচন্দ্র স্বচ্ছল বাঙ্গালী পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে তাঁকে কখনও অভাবের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়নি। না চাইতেই তিনি হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে যেতেন। কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হত না। জীবনের গোড়া থেকেই তাঁর চরিত্রে কেন যেন একটা 'স্বর্গীয় অতৃপ্তি' ছিল। তাঁর পরিবারের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে তিনি বড় হয়ে একদিন যশ খ্যাতি ও অর্থের অধিকারী হবেন। কিন্তু কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে এই ছেলেই একদিন বড় হয়ে ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন এবং পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনানায়করূপে বিশ্বের ইতিহাসে অমর কীর্তি

রেখে যাবেন। যাই হোক, সুভাষচন্দ্র পাঁচ বৎসর বয়সে প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয় স্কুলে ভর্তি হন এবং বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত এখানে পড়েন। তারপর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁকে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

কলেজিয়েট স্কুলেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সাধারণত দেখা যায় যে যারা বড়লোকের ছেলে, যারা বহু অর্থব্যয়ে বড় এবং ভাল স্কুল কলেজে শিক্ষা পায়, তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। তার কারণ অর্থের বাহুল্য-জনিত বিলাসব্যসনই তাদের জীবনের বহু সময় নিয়ে নেয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আদৌ একথা বলা চলে না। তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও পরিবেশের দাস হতে দেখা যায়নি—বরং তিনি এমন অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন যে বিলাসব্যসন তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না, তিনি ছিলেন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ঊর্ধ্বে। তাই কলেজিয়েট স্কুলে তিনি প্রত্যেকবারই নিজের শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ভাল ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষক মশায়দের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের জীবনে তিনি আদর্শ চরিত্রের প্রবীন শিক্ষক বেণীমাধব দাস মশায়ের গভীর সংস্পর্শে আসেন। এই সংস্পর্শ তাঁর জীবনের গতি ফেরাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দেশপ্রেমিক ও ধর্মনিষ্ঠ বেণীবাবুর আদর্শ চরিত্র সুভাষচন্দ্রকে মুগ্ধ করে, তিনি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই সময় সাধক রামকৃষ্ণ দেব এবং সৈনিক-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে দেখা যায়। তিনি সযত্নে রামকৃষ্ণ দেবের কথামৃত এবং স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদ্দীপক কর্মের বাণী-মুখর গ্রন্থাবলী পাঠ করতেন। তাঁর

এ সময়ের ধর্মালোচনার প্রধান সঙ্গিনী ছিলেন মাতা প্রভাবতী দেবী। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে পুত্রকে উৎসাহিত করতেন। ধর্মালোচনা ছাড়াও সুভাষচন্দ্রের এ সময়ের বড় কাজ ছিল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, পরের দুঃখ মোচন, রুগ্নদের শুশ্রূষা। কয়েকজন সমধর্মী বন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র একটি ছোট খাটো দল গড়ে তোলেন। এই দলের উদ্দেশ্য হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তোলা, পরহিতে জীবন উৎসর্গ করা, আজীবন ব্রহ্মচারী থাকা। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎরূপ তখন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা না পড়লেও এ বোধ তাঁর ছিল যে তিনি সাধারণ দশজন লোকের মত গতানুগতিক জীবন যাপনের জন্যে পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য চিনে নিতে তাঁর আরও কয়েক বৎসর সময় লেগেছিল বটে—কিন্তু তিনি তখন থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু নেতাজীর ৫০তম জন্মদিবস উপলক্ষে লাহোরের উর্দু দৈনিক 'মিলাপে' তাঁর বাল্যজীবনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, এখানে তার অংশ বিশেষ উধৃত করে দিচ্ছি:

"সুভাষ যখন মাত্র ১৫ বৎসরের বালক তখনই সে ছাত্রদের মধ্য থেকে আত্মত্যাগী কর্মীদের একটি দল গঠন করে তুলেছিল। সহরে এবং পাড়াগাঁয়ে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির মহামারী লাগলে যন্ত্রণাকাতর রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করাই ছিল এই দলের কাজ। কয়েকবার সে বহুদূরে কলেরার মহামারী লেগেছে শুনে পায়ে হেঁটে কটক থেকে সুদূর গ্রামে কষ্ট করে গেছিল। একবার সে কয়েকজন কলেরা রোগীকে শুশ্রূষা করার জন্যে জাজপুর সহরে (কটক) গেছিল। তার

এবং তার সহকর্মীদের জাজপুর রোড ষ্টেশন থেকে বহুদূর পায়ে হেঁটে জাজপুর সহরে যেতে হয়েছিল। সেখানে কয়েকদিন কাটানোর পর সে শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে ফিরে এসেছিল বাড়ীতে। তার নেতৃত্বে অপর একটি ছাত্রসঙ্ঘও গড়ে উঠেছিল—তাদের ব্রত ছিল আজীবন কৌমার্য। কিন্তু সে নিজে এবং আর ২।১জন ছাড়া এপর্যন্ত আর কেউ সে ব্রতের মর্যাদা রক্ষা করে নি।” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রদত্ত এই বিবরণের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কৈশোরের একটা নিখুঁৎ চিত্র প্রতিফলিত। তিনি যে রাতারাতি নেতাজী হয়েছেন, তা নয়। তিনি ছিলেন জন্ম-নেতা। কিশোর-বয়সেও তিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব করতেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মত তিনি স্বদলীয় ছাত্রদেরও কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে নিয়ে যেতেন। রণক্ষেত্রে উদ্যত গোলার মুখে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজের মনে অসীম সাহস সঞ্চার করতেন, তেমনি কৈশোরের সহকর্মীদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনি কলেরা বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীদের শুশ্রূষা করে তাদের মনে জন-সেবার প্রেরণা জোগাতেন। নেতৃত্বের গুণাবলী তাঁর চরিত্রে জীবনের প্রথম থেকেই ছিল। তবে বয়োবৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সব গুণ বিকাশ লাভ করেছিল মাত্র। যাই হোক, সুভাষচন্দ্রের স্কুলজীবনের যে রোজনামচা আমরা দেখলাম তাতে মনে হয় না যে তিনি নিজের পড়াশুনোর পিছনে খুব বেশী সময় দিতেন। কিন্তু তিনি এত তীক্ষ্ণধী ছিলেন যে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিবারই ক্লাসে প্রথম স্থান দখল করতেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজীতে তিনি এত ভাল করেছিলেন যে পরীক্ষক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছিলেন: "আমি নিজে পরীক্ষা দিলেও এত ভাল করতে পারতাম না।" মাত্র ষোল বৎসরের একটি কিশোরের পক্ষে এ কৃতিত্ব অর্জন কম কথা নয়। এইখানেই সুভাষচন্দ্রের উড়িষ্যার জীবনে ছেদ পড়ল —পরীক্ষায় পাশ করে তিনি এলেন কলকাতায় কলেজে পড়তে। কলেজে পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি অবশ্য মাঝে বৎসর দুই পুনরায় কটকে কাটিয়েছিলেন। যাক, সে পরের কথা।

কলেজ-জীবন ও ইংল্যাণ্ড-প্রবাস

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। স্কুল থেকে কলেজে এসেও তাঁর জীবনের ধারা বিশেষ পরিবর্তিত হল না। তা ছাড়া তিনি উড়িষ্যার আবহাওয়া থেকে এসে পড়লেন বাঙ্গলার রাজধানীর আবহাওয়ায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের কোন সুস্পষ্ট ছাপ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপর পড়ল না। ধর্ম-বোধ, ধর্মচর্চা, দীনদুঃখীর সেবা পূর্বের মতই তাঁর জীবনকে ঘিরে রইল। রাজনৈতিক বোধ তখনও কিশোর তরুণের মনে মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পায় নি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশ চিরদিনই চরম পন্থী। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর সাময়িক ভাবে সমগ্র দেশ কিছু-কালের জন্যে সুপ্ত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতের মনে নব চেতনার সঞ্চার করে বাঙ্গলাই ভারতবাসীদের সে মোহ-নিদ্রার অবসান করেছিল। বাঙ্গলা দেশের উদ্যোগী নেতাদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র তখনও কংগ্রেসের ধারক ও পোষক ছিলেন প্রধানত বাঙ্গালী নেতারাই। তা ছাড়া ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গলা দেশই ছিল অগ্রণী। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ১৯০৫ সাল একটি গৌরবময় যুগ। কটক প্রবাসী কিশোর সুভাষচন্দ্রের চোখের আড়ালেই

এ সব ঘটনা-প্রবাহের বিবর্তন হয়েছিল। তিনি যদি সে সময় এই ঘটনাবর্তের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় থাকতেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর অনিসন্ধিৎসু বলিষ্ঠ মনে আরও অল্প বয়সেই রাজনৈতিক বোধের সঞ্চার হত। তিনি যখন কলেজে ভর্তি হলেন, তখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয় হয় ভাব। তার কিছুদিন পরেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তার ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও হয়ে পড়ে কিছুটা স্তিমিত। তাই তখনও রাজনীতির দিকে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি ঘোরার সুযোগ পায় নি। তিনি তাঁর ব্রহ্মচারী-সুলভ জীবন যাপন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে তখনও আচ্ছন্ন।

অন্যান্য ছাত্রদের মত সাধারণ জীবন যাপন করতে তিনি পারতেন না। সেই খাওয়া দাওয়া, খেলাধূলো, থিয়েটার, সিনেমা দেখা—পড়াশুনো করা—এ ধরণের জীবন-যাত্রার কথা সুভাষচন্দ্র কোনদিনই ভাবতে পারেন নি। তাঁর বুদ্ধিবাদী, সত্যান্বেষী মনে এতটুকু শান্তি ছিল না—কি একটা অজানার আকর্ষণ যেন সব সময় তাঁকে বাইরের দিকে টানত। কাজেই যে বয়সে আমাদের ছেলেরা পথে পথে খেলা করে বেড়ায় কিংবা স্কুল কলেজে শান্তশিষ্ট হয়ে পড়াশুনো করে, বাড়ীতে গিয়ে ভাল ছেলের মত পিতামাতার উপদেশ অনুসরণ করে চলে, নিজের একটা স্বাধীন মতামতই যে বয়সে জন্মায় না, সেই বয়স থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্য ধরণের। তিনি তখন ধর্মকর্ম করছেন, ধর্মের পথে মুক্তি খুঁজছেন। তাঁর কিশোর হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা কেউ বুঝত কিনা জানি না—তবে তিনি নিজে এ ব্যাকুলতার সন্ধান রাখতেন। কলকাতায় এসেও তিনি তাঁর সমধর্মীদের একটা দল পেয়ে গেলেন।

সেই সময় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ছাত্রদের একটি দল গড়ে উঠেছিল। এই দলের আদর্শ ছিল কৌমার্যব্রত পালন, দীন দুঃখীর সেবা এবং ধর্মজীবন যাপন। সুভাষচন্দ্র এই দলের আদর্শের মধ্যে নিজের জীবনাদর্শের কিছুটা প্রতিফলিত দেখলেন। তাই তিনি অবিলম্বে এই দলে অন্যতম উৎসাহী সদস্যরূপে যোগ দিলেন। এই খানেই ত্যাগব্রতী কংগ্রেস নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

এমনি করে কলেজ জীবনের একটি বছর কেটে গেল। কিন্তু অশান্ত সত্যান্বেষীর মনে শান্তি নেই—তিনি যেন সব সময় কিসের একটা অভাব অনুভব করেন। কিশোর সত্যান্বেষীর হৃদয়ের সে অন্ধ ব্যাকুলতা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না—হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। এই রকম একটা অজানার টানেই একদিন বুদ্ধ স্ত্রী পুত্র রাজ্যপাট ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, চৈতন্য করেছিলেন গৃহত্যাগ, স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন হিমালয়বাসী। ধর্মপিপাসু সুভাষচন্দ্র এঁদের সকলের কথাই মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে হিমালয়ে গেলে তিনি হয়ত প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাবেন—যিনি তাঁকে দেবেন প্রকৃত পথের নির্দেশ। ধর্মই তখনও তাঁর জীবনের মূল বস্তু। তাই এই অজানার আহ্বানে অসীম শান্তিলাভ এবং মুক্তির আশায় ১৯১৪ সালে তিনি হঠাৎ একদিন করলেন গৃহত্যাগ। কাউকে কিছু বলে যান নি—কেননা তিনি জানতেন যে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীদের তিনি যেরূপ প্রিয়, তাতে তাঁর সংকল্পের কথা জানতে পারলে

কেউ তাঁকে যেতে দেবে না। তাই এক সমধর্মী বন্ধুর সঙ্গে তিনি রিক্ত হস্তে যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে—উদ্দেশ্য গুরুলাভ। তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রায় পরিবারে বজ্রাঘাত হল। পরিবারের সকলেরই তাঁর উপর যেমন বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি ছিল, তেমনই ছিল তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা। উদ্বিগ্ন চিত্তে সুভাষচন্দ্রের স্নেহময়ী জননী পুত্রের পুনর্দর্শন আশায় রাতের পর রাত জেগে কাটাতে লাগলেন—এ যেন গৃহত্যাগী নিমাইর জন্যে শচীমাতার উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা। এখানে সেখানে খোঁজ-খবর করা হল—কিন্তু কোথাও সুভাষচন্দ্রের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। সত্যান্বেষী তরুণ তখন হিমালয়ের পাদমূলে হরিদ্বার, মথুরা প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বিশ্রাম নেই—অহরহ শুধু গুরুর চিন্তা। সারা পৃথিবী যখন রাত্রির কোলে নিদ্রামগ্ন তখনও নির্ভীকচিত্ত তরুণ স্থান থেকে স্থানান্তরে যাচ্ছেন গুরুমিলনের প্রত্যাশায়। এমনই ভাবে তিনি পুরো ছয়টি মাস ভারতের বহু বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন। হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি বহুস্থানে তিনি গেলেন। কোথাও তাঁর ঈপ্সিত গুরুর সন্ধান মিলল না। এই গুরুর সন্ধান না পাওয়া আমাদের দেশের পক্ষে ভালই হয়েছে। সুভাষচন্দ্র যদি প্রকৃত গুরুর সন্ধান পেতেন, তবে কোনদিন হয়ত আর গৃহ-জীবনে ফিরে আসতেন না। ফলে তরুণ ভারত হারাত এক মহা শক্তিশালী বিপ্লবীকে যিনি আজ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে নতুন ভাবে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

বিভিন্ন স্থানে সাধু মহান্তদের বিলাসী জীবনযাত্রা দেখে সুভাষচন্দ্র তাঁদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। স্পর্শকাতর তরুণ মনের উপর

বাস্তবের এই আলোকসম্পাতে মিথ্যা মোহ ভেঙে গেল। এদিকে ক্রমশঃ অতি পরিশ্রমে এবং অনভ্যস্ত জীবন যাপনে তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে পড়ছিল। তিনি দেখলেন যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তথাকথিত সাধু মহান্তরা সাধারণ লোকদের চেয়েও বেশী বিলাসী, আয়েসী এবং স্বার্থবাদী। তাছাড়া, বারাণসীতে তাঁরা যখন রামকৃষ্ণ মিশনের এক কর্মীর সঙ্গে কিছুকাল কাটান, তখন তিনি সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুকে বৃথা কালক্ষেপ না করে বাড়ী ফেরার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র একে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার উপর অনিয়ম অত্যাচারে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে সুরু করেছিল। তাই তিনি প্রায় ছয় মাস পরে কলকাতায় ফিরে আসাই মনস্থ করলেন। ফলে তিনি সম্পূর্ণ নাটকীয় ভাবেই একদিন ফিরে এলেন বাড়ীতে। তাঁর পরিবারের প্রায় সবাই বসেছিলেন বৈঠকখানায়। সুভাষচন্দ্র সরাসরি এসে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লেন এবং সোজা মার কাছে গিয়ে তাঁর পদধূলি মাথায় তুলে নিলেন। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের আনন্দাতিশয্যে সকলেই বিস্মিত, হতবাক। সবচেয়ে যিনি বেশী আনন্দ পেলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের জননী। রাতের পর রাত মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ-যাত্রী পুত্রের প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। পুত্রের আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে আনন্দাশ্রুতে তাঁর দুচোখ ভরে গেল—তিনি সস্নেহ কাতরোক্তি করে উঠলেন : "সুভাষ, তুই আমাকে মেরে ফেলার জন্যেই জন্মেছিস!" বিষাদাচ্ছন্ন বসু পরিবারে আবার আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

বাড়ীতে ফিরে আসার পরেই বোঝা গেল যে অনির্দিষ্ট ভ্রমণের ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি যে অনিয়ম অত্যাচার

করে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন, প্রকৃতি এতদিনে তার প্রতিশোধ নেওয়া সুরু করল। বাড়ীতে ফেরার কিছুদিন পরেই তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের জের বেশ কিছুদিন চলেছিল। কিন্তু এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি পুনরায় পড়াশুনো আরম্ভ করেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই আই-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি যেরূপ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাতে নিরুদ্দেশ ভ্রমণে এবং তজ্জনিত রোগে প্রায় বৎসর খানেক নষ্ট না হলে—তিনি পরীক্ষায় আরও ভাল ফল করতে পারতেন।

সুভাষচন্দ্র সাময়িক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে গৃহত্যাগ করে গেছিলেন এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। তিনি সুস্থমস্তিষ্কে বেশ ভেবেচিন্তেই গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং পরে বাস্তব সংঘর্ষে তাঁর ভুল ভেঙে যাওয়ায় আবার গৃহে ফিরে এসেছিলেন। কৈশোর থেকেই তিনি তাঁর সব কাজের পিছনে একটা ঐশী প্রেরণা অনুভব করতেন এবং এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তিনি প্রকৃত গুরুর সন্ধান লাভের প্রত্যাশায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। তিনি যে প্রকৃত গুরুর সন্ধান পান নি—তার ফল আমাদের রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে সব দিক দিয়েই শুভ হয়েছে। স্পষ্টভাবে না হলেও সুভাষচন্দ্র এই আঠারো বৎসর বয়সেও নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে ফিরে আসার পরেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একটি বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিলেন: "আমি ক্রমেই উপলব্ধি করছি যে আমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং তারই জন্যে আমি এ দেহ ধারণ করে চলেছি—জনসাধারণের মতে তৃণের মত

ভেসে যাওয়া আমার কাজ নয়। লোকেরা আমার প্রশংসা করবে কিংবা নিন্দা করবে—পৃথিবীর রীতিই এই—কিন্তু আমার গভীর আত্মসচেতনতার ফল এই যে আমাকে তা নাড়া দিতে পারে না।" আঠারো বৎসরের একটি কোমলমতি তরুণের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট দৃঢ় সঙ্কল্প বিস্ময়কর নয় কি? তিনি নিজের সম্বন্ধে এই বয়সেই যা বলে গেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। পরজীবনে আমরা দেখেছি যে তিনি নিন্দা এবং প্রশংসা দুহাত দিয়ে কুড়িয়েছেন। কিন্তু যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন, শত নিন্দাও তার থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এটা সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় চরিত্রের একটা বড় বিশেষত্ব।

আই-এর পর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই বি-এ পড়তে থাকেন। এর পরেই আসে তাঁর ছাত্রজীবনের বড় দুর্ঘটনা—ওটেন সাহেবকে মারার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর বিদায়। বি-এতে সুভাষচন্দ্র দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়েছিলেন। নিজের চারিত্রিক সবলতা, কর্মকুশলতা এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের জন্যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব পদে বৃত হন। ছাত্ররা তখন তাঁর কথায় ওঠে বসে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে মিঃ সি, এফ, ওটেন নামে ইংরেজী সাহিত্যের একজন অধ্যাপক ছিলেন। এই অধ্যাপক প্রবর পরে বাঙ্গলার জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার হয়েছিলেন। এই শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক প্রবরের মনে সাম্রাজ্যবাদী জাতিসুলভ গর্ব কিছুটা বেশী পরিমাণেই ছিল। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করতে চাইতেন না। তিনি প্রায়ই ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। তাঁর এই ঔদ্ধত্য,

জাতিগর্ব এবং দুর্ব্যবহারে সমগ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ভারতীয় ছাত্র-সমাজ ছিল তাঁর উপর চটা। বিশেষ করে, ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের এ দুর্ব্যবহার সুভাষচন্দ্রের মনেই ব্যথা দিত সর্বাপেক্ষা বেশী—কেননা তাঁর মনে জাতীয় মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি অধ্যাপক প্রবরের এই অবিচ্ছিন্ন দুর্ব্যবহারে মনে মনে ভয়ানক রেগে ছিলেন। একদিন এই ওটেন সাহেব তাঁর স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যবশত বি-এ ক্লাসের একটি ভারতীয় ছাত্রের গালে চপেটাঘাত করেন। কলেজে এ জাতীয় ঘটনা অভিনব এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সুভাষচন্দ্র তখন গোপনে ছাত্রদের সভা-সমিতি ডেকে ছাত্র সমাজের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা মিঃ ওটেনের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করল। তাঁর নেতৃত্বে ধর্মঘট এত সাফল্যপূর্ণ হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক আপোষরফা করতে বাধ্য হন। ছাত্র-সমাজের এই বিজয়ে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক প্রবর সাময়িক ভাবে ঘাবড়িয়ে যান এবং কিছুদিন সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু চিতাবাঘের পক্ষে তার গায়ের দাগ মুছে ফেলা যেমন অসম্ভব, মিঃ ওটেনের পক্ষে তেমনই জাতিগর্ব ভুলে থাকা ছিল অসম্ভব। তিনি তাঁর পুরণো রোগের হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি পেলেন না। এই ঘটনার মাসখানেক পরে ওটেন সাহেব পুনরায় ছাত্রদের অপমানিত করেন। এবার আর ছাত্ররা প্রতিকারের জন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গেল না। তারা নিজেরাই মিঃ ওটেনের শাস্তির ব্যবস্থা করল। মিঃ ওটেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হলেন।

এই ঘটনা নিয়ে সারা কলেজে হৈ চৈ পড়ে গেল। বিব্রত অধ্যক্ষ ভবিষ্যতে আবার যাতে এরূপ ঘটতে না পারে, তার জন্যে কয়েকজন ছাত্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করলেন। ধর্মঘটের পর থেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষ জানতেন যে সুভাষচন্দ্র ছাত্র-সমাজের অবিসম্বাদিত নেতা। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে মারপিটের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অন্যতম পাণ্ডা এবং এই জন্যে তাঁকে অন্যান্য আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ওটেনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে একটা সাময়িক ছেদ পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হবার ফলে তিনি কটকে ফিরে যান এবং সেখানে প্রায় দুবৎসর কাল কাটান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি পান। তবে এবার আর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে গেলেন না—তিনি ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। সামরিক নিয়মানুবর্তিতা এবং সামরিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি সুভাষচন্দ্রের মনে যে একটা অচেতন ঝোঁক ছিল তার প্রমাণ মেলে এই সময়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে 'ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোর' সবে মাত্র গড়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই ট্রেণিং কোরে যোগ দেন এবং মহোৎসাহে কুচকাওয়াজ করতে থাকতেন। ধর্মের প্রভাব পুরোপুরি তখনও কাটে নি; অবশ্য তিনি চিরকালই কিছুপরিমাণে ধর্মভীরু এবং নৈষ্ঠিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তবে এই সময় তিনি কৈশোরের সন্ন্যাসী হবার স্পৃহা কাটিয়ে

ক্রমশ কর্মের দিকে ফিরতে স্থরু করলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ থেকেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

কলেজ-জীবনে মিঃ ওটেনের ঘটনা স্থভাষচন্দ্রের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তনের স্থচনা করে। এই সর্বপ্রথম তিনি শ্বেতাঙ্গ শাসক-জাতির মজ্জাগত ঔদ্ধত্যের মুখোমুখী এসে দাঁড়ান এবং তার ঘৃণ্য স্বরূপ দেখে শিউরে ওঠেন। এই প্রথম তাঁর মনে শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষের বীজ উপ্ত হয় এবং স্পষ্টভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার স্পৃহা রূপ নেয়। ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসনের নামে সোনার ভারতকে নির্মমভাবে শোষণ করে নিজেদের দ্বীপের শ্রীবৃদ্ধি করে—আবার আমাদেরই উপর চোখ রাঙ্গায়—তাঁর কাছে এ যেন কেমন অসহ্য লাগে। তাঁর জীবনের যাত্রাপথ তখনও অনিশ্চিত। তখনও কেউ জানত না যে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ অধ্যাপককে মারপিট করার অভিযোগে যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়ানো হল, তিনিই একদিন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে বারবার কারাকক্ষে নিক্ষেপ করতে হবে। শুধু তাই নয় চরম বিপ্লবী হিসাবে তাঁকে মান্দালয়ের নির্জন কারাকক্ষেও বন্দী করে রাখা হবে।

আমরা তাঁর কলেজজীবনের যে বর্ণনা দিয়েছি তাঁর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে স্থভাষচন্দ্র বুঝিবা আর্ত-দীনদের সেবা করে

এবং কলেজের অধ্যাপক ঠেঙ্গিয়েই কাল কাটাতেন। তা মোটেই নয়। পড়াশুনোর দিকেও তাঁর যথেষ্ট নজর ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ জীবনে তাঁর সতীর্থ কবি-ঔপন্যাসিক-সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে সুভাষচন্দ্র সেই বয়সেই দেশী বিদেশী অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারের রচনাবলী পড়েছিলেন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে তিনি অকাতরে এই সব গ্রন্থ থেকে উধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে একটা বলিষ্ঠতা এবং মাধুর্য আছে, তা সেই বয়সেই ধরা পড়েছিল—বয়েস নির্বিশেষে সকলেই তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলত। ছাত্রসমাজকে ভাবীযুগের মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেদের মধ্যে ডিবেটিং ক্লাব বা বিতর্ক-সভার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর মন ক্রমশ রামকৃষ্ণ দেবের সাধনার পথ থেকে দূরে সরে আসছিল—আর তিনি ক্রমশ কর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠানে তাঁর যে আদর্শ ছিল সে সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত রায়কে নিম্নোক্তরূপ বলেছিলেন ঃ "আমি চাই যে আমাদের ছেলেরা চটপট ভাববার শিল্পটি শিখুক। তারপর বিতর্ক-শিল্প মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগায়। এটা নিশ্চয়ই বড় লাভ। আমরা ভারত-বাসীরা কাজ, মতামত, কর্মোদ্যোগ—সব কিছুর জন্যই বড় পরের উপর নির্ভরশীল। কাজেই আমি স্থির করেছি যে নিজেদের পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে বিতর্ক-সভাই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে!" একবার ভেবে দেখুন তো—এই কথাগুলি যিনি বলেছেন, তিনি আঠার বৎসরের একটি কলেজী ছাত্র! আইন অনুসারে তখনও তিনি

সাবালকত্ব অর্জন করেন নি। সুভাষচন্দ্রের এই জন্মগত নেতৃত্ব-শক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বলেছেন: "কিন্তু যখন আমরা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটরা সুভাষের সঙ্গে কথা বলতাম, কেমন করে জানি না আমরা সবাই তাঁকে আমাদের চেয়ে কয়েকবৎসরের বড় বলে মনে করতাম। তাঁর নেতৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তা জানতেন। আমি জানি এই সচেতনতার গভীর অসুবিধা আছে এবং এর ফলে সুভাষের কখনও কোন ক্ষতি হয় নি—এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু আমি বিশ্বাসের সঙ্গে একথা বলব যে যারা তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলত, তাদের তিনি কখনও অনুভব করতে দিতেন না যে তারা তাঁর চেয়ে ছোট।" শ্রীযুক্ত রায়ের এ উক্তি যে কত সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ব্যাপারে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান শিখ নির্বিশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা নেতাজীর সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাশীল। নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব এবং সদাশয়তার গুণেই তিনি তাঁর সৈন্যদলের উপর এ অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যনির্বিশেষে তিনি সকলকেই সমান চোখে দেখতেন—সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন।

সুভাষচন্দ্র বি-এ পাশ করে যখন এম্-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন তখন ১৯১৯ সাল। ভারতের রাজনৈতিক জীবন তখন বিরুদ্ধ ঘটনাসংঘাতে বিক্ষুব্ধ—চঞ্চল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভারতবর্ষকে ভরসা দেওয়া হয়েছিল যে যুদ্ধ শেষে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বৃটিশ কূটনীতিবিদরা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। ভারতের

ভাগ্যে জুটল একদফা শাসন-সংস্কার—মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার। সারা ভারতের জনমত এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাউলাট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাব পুলিশের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ প্রশ্ন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংহত শক্তি নিয়ে লড়াই করার পরিকল্পনা করছে। শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে বিদ্বেষ তখন চরম আকার ধারণ করেছে। জনমতের বিক্ষোভ দমন কল্পে সরকারী কর্তৃপক্ষ সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন—জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তার, শান্তিপূর্ণ জনসভার উপর নিষ্ঠুর গুলী বর্ষণ, প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ পড়েনি। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এই সময়েই পরম সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর আবির্ভাব। যুবক সুভাষচন্দ্রের মনে স্বদেশপ্রেম তখন স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে—তিনি বুঝেছেন যে দেশকে তিনি ভালবাসেন এবং বিদেশী শাসকশক্তির হাত থেকে দেশের মুক্তিকামনা করেন। সুভাষ-চন্দ্রের মাতাপিতাও তাঁর মনের খবর রাখতেন। তাঁদের মনে খুব আশা ছিল যে তিনি বড় সরকারী চাকুরে হবেন। তা না হয়ে, একবার স্বদেশ সেবার দিকে যদি তাঁর ঝোঁক যায়, তবে তাঁকে ফেরানো যে সহজ হবে না—এ সত্যও তাঁরা জানতেন। তাই বি-এ পাশ করার পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে আই-সি-এস পড়ার জন্যে ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর সংকল্প ব্যক্ত করলেন। তাঁদের মনে ধারণা ছিল যে একবার রাজার দেশের হাওয়া তাঁর গায়ে লাগলে, উগ্র স্বদেশ-প্রেম ভুলে যেতে তাঁর বেশী সময় লাগবে না।

বিলাত যাবার প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। তিনি

তখনও তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে ইতি-কর্ত্তব্য ভেবে স্থির করে উঠতে পারেন নি। একদিকে পিতামাতার কথা রাখা, তাঁদের মনের ইচ্ছা কাজে পরিণত করে তাঁদের তৃপ্তি দেওয়া—অপরদিকে দেশ-মাতৃকার সেবা। তিনি কোন দিকে যাবেন? তখন তাঁর চোখের উপরই পাঞ্জাবে সামরিক আইনের কড়াকড়ি—দেশব্যাপী সরকারী অত্যাচার। যে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রজাপীড়ন করে চলেছে, তাদেরই কৃপাভিক্ষার জন্যে তাঁকে যেতে হবে ইংল্যাণ্ডে। দেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন যে বিলাত যাবেন না। এমন সময় তাঁর প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারের উপদেশে তিনি ইংল্যাণ্ড যেতে সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর মনে পূরো মাত্রায় সন্দেহ ছিল যে তিনি যদি আই-সি-এস্ পরীক্ষায় পাশ করে বসেন, তবে তাঁর আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। হেমন্তবাবু যখন তাঁকে বিলাতে যাবার উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেনঃ "কিন্তু আমি যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করি, তবে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তখন আমি হয়ত আদর্শ হারিয়ে ফেলব।" অবশেষে বহু চিন্তা ভাবনা করে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবেই ইংল্যাণ্ড যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁর মনের ভাব কেমন ছিল, তাঁর একটী বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তার সন্ধান মেলেঃ "মানসিক উদ্বেগের মধ্যে আমার গত কয়েকদিন কেটে গেছে। নিজের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করে আমি ইংল্যাণ্ডে (আই-সি-এস্ পড়ার জন্যে) যেতে সম্মত হয়েছি —কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক হয়েছে একথা মনকে এখনও বোঝাতে পারিনি।"

এইভাবে সুভাষচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গেলেন। তাঁর জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্য প্রায় স্থির হয়ে গেছে। তবে তখনও প্রকাশ্যে তিনি সে কথা ঘোষণা করেন নি—এই মাত্র। ফলে ইংল্যাণ্ডে গিয়েও তাঁর জীবন-যাত্রার ধারা বদলালো না—রাজার দেশের আবহাওয়া তাঁর মনে কোনই পরিবর্তন আনতে পারল না। বরং ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রীতি আরও চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে লাগল। তিনি দেখতে পেলেন ইংরেজরা তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে সেখানকার যুবকযুবতীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত বেশী আশাবাদী—ছেলেমেয়েরা বিনা খরচে সামরিক এবং সাধারণ শিক্ষা পায়—সমগ্র দেশ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মন্ত্রে মুখর। ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের চিত্র পাশাপাশি রেখে সুভাষচন্দ্র এইবার তুলনা করে দেখবার সুযোগ পেলেন। তিনি দেখলেন যে ইংরাজদের শাসন ও শোষণের ফলে ভারতবর্ষ আজ মেরুদণ্ডহীন দাসমনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে পড়েছে—নিজেদের দেশে যে ইংরেজরা এমন সাধু সজ্জন, ভারতে গিয়ে তারাই হয়ে ওঠে অত্যাচারী। এই ইংরাজ শাসনের ফলেই ভারতে দেখা দিয়েছে সর্বব্যাপী দারিদ্র, অশিক্ষা, প্রতিক্রিয়াশীলতা। তিনি বুঝলেন যে বিরাট ভারতবর্ষকে অগ্রগতি ও উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করতে হলে, সর্বাগ্রে চাই বৈদেশিক শাসন-মুক্তি। ইংল্যাণ্ডে বসে বসে সুভাষচন্দ্র ভারতের এই ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থার কথাই শুধু চিন্তা করতেন। দেশে তখনও ১৯১৯ এর সরকারী অত্যাচারের জের পুরো মাত্রায় চলছে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। সমগ্র দেশ তাঁর নেতৃত্বে বৈদেশিক শাসন-মুক্তির প্রয়াসে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে বসে

এসব খবরও পেতেন এবং সযত্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীন কার্যকলাপ অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। তাঁর ইংল্যাণ্ড প্রবাস তাঁকে আরো বেশী পরিমাণ ব্রিটিশ-বিরোধী করে তুলল। আধুনিক ভারতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা—যেমন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি—এঁদের সকলেই ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাঁদের মনে সাহেবিয়ানা সৃষ্টি করে তাঁদের দাস-মনোভাবাপন্ন ত করতেই পারে নি—বরং তাঁরা হয়ে উঠেছেন বেশী পরিমাণে ব্রিটিশ-বিরোধী। পরাধীন ভারতসন্তানের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের মুক্ত স্বাধীন আবহাওয়া তাকে নিজের পরাধীনতার অভিশাপ সম্বন্ধেই অধিকতর সজাগ করে তোলে।

সুভাষচন্দ্রের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং স্বদেশ প্রেম ক্রমশ কি ভাবে দানা বাঁধছিলো, বিলাতে পৌঁছে বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা একাধিক চিঠি থেকে তার সন্ধান মেলে। একটি পত্রে লিখেছিলেন: "আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়া আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা পরিষ্কার করিতেছে।" বিলাতে গিয়ে তিনি যদিও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, তবু তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে সিভিল সার্ভিস শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে টিকবে না। শ্রীযুক্ত সরকারকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "আমার মতলব আগামী বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি—১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার ডিগ্রী আমাকে লইতে হইবেই—কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।" আর এক

পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "এখনও বুঝিতে পারি নাই আমি আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়েছি কিনা। আমি আত্মপ্রতারণা করে নিজেকে বুঝাতে চাই না যে Civil Service এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিসটাকে ঘৃণা করতাম, এখনও বোধ হয় করি। এ অবস্থায় Civil Service এর জন্য চেষ্টা করা দুর্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্তী মঙ্গলের সূচক, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।" এই দুইটি উধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র নিজের ভবিষ্যৎ ইতিপূর্বেই স্থির করে ফেলেছিলেন। শুধু পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের মন রাখার জন্যেই তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ইংল্যাণ্ডে ছিলেন এবং এই মহিয়সী মহিলার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র যে চরম পন্থার সন্ধান পেয়েছিলেন, তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি সুভাষচন্দ্রের ঝোঁক চিরদিনের। আপোষরফার স্থান তাঁর কাছে ছিল না হেমন্তবাবুকে লেখাই অপর একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্তা নাইডু এবং অন্যান্য ভারতীয় মহিলাদের বক্তৃতা সম্বন্ধে কি বর্ণনা দিয়েছিলেন শুনুন : "যে দিন Mrs. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেদিন আনন্দে বুক দশ হাত ফুলে উঠেছিল, সেদিন দেখিলাম ভারত-রমণীর আজও এমন শিক্ষা, দীক্ষা, গুণ ও চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা আত্মপরিচয় দিতে পারেন। লণ্ডনে মিসেস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। দেখিলাম মিঃ মিত্র moderate in politics, কিন্তু মিসেস মিত্র extremist—দেখে মনে

হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চ, সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না।" ভাবী আই, সি, এসের মুখে এই প্রকার চরমপন্থী রাজনীতির গুণ গান শুনে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর মনের গতি বিপরীত দিকে চলেছে। যে তরুণের মনে স্বদেশ-প্রেমের এমন জ্বলন্ত আদর্শ তাঁর জীবনযাত্রাও সহজে অনুমান করা যায়। আমাদের দেশের অনেক বড়লোক-নন্দন, আই, সি, এস পরীক্ষার জন্যে কিংবা ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে দুহাতে পিতার অর্থ ছড়িয়ে মজা লোটেন। আমোদ-প্রমোদ এবং নারীসঙ্গ লাভ হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান কাম্য। ইংল্যাণ্ডে এক ধরণের যুবতীরা সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে ভারতীয় যুবকদের ফাঁদে ফেলার জন্যে। তাদের ধারণা যে ভারত থেকে যেসব যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইংল্যাণ্ডে আসে তারা রাজা মহারাজেরই সমগোত্র। কাজেই তাদের কারও স্ত্রী হবার অধিকার অর্জন করতে পারলে তারা পরম সৌভাগ্য মনে করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। হালকা আমোদ-প্রমোদে তিনি আনন্দ পেতেন না। তাঁর পিতার অর্থাভাব ছিল না। কিন্তু তিনি ইংল্যাণ্ডে খুব মিতব্যয়ী, সংযমী জীবন যাপন করতেন। সারা জীবন ধরে আমরা তাঁকে এই আদর্শ পালন করে আসতে দেখেছি।

ইংল্যাণ্ডে পদার্পণের পর মাত্র নয় মাসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস পরীক্ষা দিলেন এবং ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এই পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেন বটে—কিন্তু তাঁর

আদর্শচ্যুতি ঘটল না। যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার প্রত্যাশায় বহু ভারতীয় যুবক নিজেদের পরম ভাগ্যবান বলে মনে করে, সুভাষচন্দ্র সেই পরীক্ষায় চমৎকার কৃতিত্ব লাভ করে হয়ে উঠলেন অনুতপ্ত। তিনি ভারতে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে আমি আই-সি-এস পাশ করে ফেলেছি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। এখন উপায়?"—উপায় আর কি? তিনি যথানিয়মে সরকারী বৃত্তি নিয়ে শিক্ষানবিশী করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রীর জন্যেও প্রস্তুত হতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্রের দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ কত প্রবল ছিল—সে সম্বন্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই: "সে (সুভাষচন্দ্র) যখন ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশী করছিল, তখন ইণ্ডিয়া অফিস থেকে প্রচারিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে শিক্ষানবিশরা যখন ভারতে ফিরে যাবেন তখন তাঁরা যেন তাঁদের ঘোড়াগুলোর খাবার ও সহিসাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল যে ঘোড়ার খাবারই সহিসের খাবার। এই বিজ্ঞপ্তি ভারতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করেছে বলে যুবক সুভাষ এই অসম্মানকর বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া অফিসে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। ইণ্ডিয়া অফিস থেকে বলা হয়েছিল যে আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিটি ইতিপূর্বেই প্রচারিত হয়ে গেছে; তবে ভবিষ্যতে যাতে বিজ্ঞপ্তিতে অসম্মানজনক কথাগুলো না থাকে তার ব্যবস্থা করা হবে।" ১৯২১ এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের আদর্শ তখন স্থির করে ফেলেছেন। ভারতে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে বসে বসে এ সব সংবাদ পেতেন এবং তাঁর মন শৃঙ্খলিতা ভারতমাতাকে মুক্ত করার কামনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠত। ১৯২১ এর মে মাসে তিনি আই-সি-এস পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে ফিরে গিয়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। তিনি নিজেই তাঁর পদত্যাগ পত্র নিয়ে তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ মণ্ট্যাগুর কাছে গেলেন। ভারত সচিব তাঁকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্যে অনেক অনুরোধ জানালেন—কিন্তু কোন কাজ হল না। কেননা সুভাষচন্দ্র ত আর ঝোঁকের মাথায় এমন লোভনীয় চাকুরী ছেড়ে দিচ্ছিলেন না। অনেক ভেবে চিন্তেই তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এমনই করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস তাঁর মত একজন সুযোগ্য রাজকর্মচারী হারাল বটে—কিন্তু তাঁর মত একজন সুযোগ্য দেশপ্রেমিক নেতা পেয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠল। এমনই ভাবে সুভাষচন্দ্রের ইংল্যাণ্ড প্রবাস শেষ হল। তাঁর পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনরা আশা করেছিলেন যে তিনি আই-সি-এস হয়ে ফিরে আসবেন—আর তিনি ফিরে এলেন আই-সি এস পদত্যাগ করে—স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে। সুভাষচন্দ্রের এ অপূর্ব ত্যাগে সমগ্র দেশ মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি কেন এমন লোভনীয় পদ ত্যাগ করলেন, সে সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন: "আমি ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম—কিন্তু দেখলাম যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং আমার স্বদেশ—এই দুই প্রভুর সেবা এক সঙ্গে করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। কাজেই ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করে আমি দেশে যে-স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলছে, সেই সংগ্রামে আমার নিজের স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে এলাম।"

রাজনৈতিক কর্মজীবন—কারাদণ্ড ও নির্বাসন

নতুন আশার উদ্দীপনা ও জলন্ত স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা বুকে নিয়ে যুবক সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই বোম্বাইতে পদার্পণ করলেন। জাহাজ থেকে নেমেই তিনি গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজী তখন বোম্বাই সহরে মণিভবনে বাস করছিলেন। সমগ্র দেশে তখন অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন পূরোদমে চলেছে। এই আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীর মুখ থেকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম জানার জন্যেই সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু এই প্রথম দর্শনেই গান্ধীজীর শান্ত সমাহিত মূর্তি এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। চরম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মধ্যে যে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক দেখার প্রত্যাশা করেছিলেন তা তিনি দেখতে পেলেন না—দেখতে পেলেন সর্বত্যাগী রাজনীতি-সুনিপুণ একটি ফকিরবেশী মহাত্মাকে। তাই তিনি কিছুটা হতাশই হলেন বলা চলে। গান্ধীজী তাঁকে নির্দেশ দিলেন বাংলায় ফিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করতে। দেশবন্ধু তখন তাঁর বিপুল ত্যাগ এবং রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার দরুণ সমগ্র বাংলার হৃদয় জয় করেছেন—তিনি তখন বাংলার মুকুটহীন রাজা। প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, দেশের জন্যে সর্বত্যাগী এবং উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিবাদী

নেতারূপে দেশবন্ধুর খ্যাতি তখন সারা ভারতব্যাপী। সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় ফিরেই দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দেশের যুবশক্তির এই পরম বন্ধু ধৈর্যের সঙ্গে এই বিপ্লবী তরুণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলেন এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রথম দর্শনেই দেশবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের জন্যে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। সুভাষচন্দ্রও দেশবন্ধুর আন্তরিক সংস্পর্শে এসে তাঁকে নেতা বলে মেনে নিলেন এবং তাঁরই নির্দেশে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে তখন বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। কত বড় বড় লোক সরকারী চাকুরী ছেড়েছেন, কত উকিল ব্যারিষ্টার দেশের আহ্বানে নিজেদের লোভনীয় আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেছেন। এই সময় ত্যাগব্রতী নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অ্যাসে মাষ্টারের (Assay Master) পদ ত্যাগ করে দেশের সম্মুখে এক বিরাট আদর্শ স্থাপন করেন। বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে স্কুল কলেজের বহু ছাত্রছাত্রীও পড়াশুনো ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। যারা স্বেচ্ছায় দেশের কাজের জন্যে পড়াশুনো ত্যাগ করেছিল এবং দেশের কাজে যোগদানের জন্যে যাদের স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের নৈতিক দায়িত্ব এসে পড়ল কংগ্রেসের উপর। এই সময় বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস নেতাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে জাতীয় স্কুল কলেজ সংস্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশে যে জাতীয় স্কুল কলেজ স্থাপিত



হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বভার ছিল দেশবন্ধুর উপর। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা, তাঁর স্বদেশ প্রেম ও ত্যাগব্রতী চরিত্রের পরিচয় পেয়ে তাঁকেই জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের দায়িত্বও সুভাষচন্দ্রের স্কন্ধে এসে পড়ে। এর কিছু পরে যে কংগ্রেস জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়, তারও পরিচালনার ভার পান সুভাষচন্দ্র। তিনি তাঁর ত্রিবিধ দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। জাতীয় কলেজ তাঁর পরিচালনাধীনে দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে যেতে থাকে। জাতীয় কলেজে যারা শিক্ষা পেতে থাকেন, তাঁদের পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও তাঁদের নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং তাঁদের মনে স্বদেশ প্রেমের বীজ বপনে তরুণ অধ্যক্ষ নিপুণতার পরিচয় দেন। গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলোকে অবজ্ঞা করে গেলেও, অতি শীঘ্রই এগুলোর কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং কিভাবে এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। তরুণ অধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রের কাজে বাংলা গবর্ণমেণ্টও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং অঙ্কুরেই জাতীয় কলেজকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারসচিব রূপেও সুভাষচন্দ্র ইস্তাহার রচনায় অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন বিবৃতি ও প্রচার পত্রাদি পড়ে কলিকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় দৈনিক 'ষ্টেটসম্যান' পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সখেদে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের মত অসাধারণ শক্তিমান রাজকর্মচারীকে হারিয়ে বৃটিশ আমলাতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলাতেও সুভাষচন্দ্র অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কলেজ-জীবনে ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগ দিয়ে তিনি যে সামরিক শিক্ষালাভ করেছিলেন, তা এখন কাজে লাগে। তাঁর নেতৃত্বে, তাঁর কর্মনৈপুণ্যে, তাঁর অদম্য উৎসাহে জাতীয় স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে বোম্বাইতে অবতরণ করেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ, র‍্যাউলাট অ্যাক্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে সমগ্র দেশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এমন বিমুগ্ধ হয়ে ছিল যে দেশবাসীরা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করতে সম্মত হয় না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ব থেকেই স্থির করেছিলেন যে যুবরাজের ভারত পরিভ্রমণ কালে সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হবে এবং কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে। কংগ্রেসের এই আহ্বানে সমগ্র জাতি সাড়া দেয়। ১৭ই নবেম্বর যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। সেদিন ভারতের সর্বত্র প্রধান প্রধান সহরগুলিতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। সেদিন কলিকাতা সহরেও সুভাষচন্দ্রের সুদক্ষ পরিচালনায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

এদিনের হরতালের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল এই যে কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকগণের প্রচেষ্টায় কোথাও কোনশান্তিভঙ্গ হয় নি—অথচ সমগ্র নগরে দেশীয় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালন করেছিল। এই সাফল্যপূর্ণ হরতালের দৃশ্য দেখে বাংলার কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গেলেন। নির্দ্ধারিত সময় তালিকা অনুসারে স্থির ছিল যে যুবরাজ ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতায় পৌঁছুবেন। কিন্তু তার একমাস পূর্বেই বাংলা গবর্ণমেণ্ট

কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে অবৈধ ঘোষণা করলেন এবং তিন মাসের জন্যে কলিকাতা ও সহরতলীতে জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হল। কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা এই সরকারী আদেশ অমান্য করা স্থির করেন এবং তার ফলে ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। তাঁদের প্রত্যেকেরই কারাদণ্ড হয়। সুভাষচন্দ্র এই সর্বপ্রথম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচার শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন রায় দেন যে সুভাষচন্দ্রকে ছয় মাসের জন্যে কারাদণ্ড দেওয়া হল, তখন সুভাষচন্দ্র সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন "ছয় মাস মাত্র! আমি কি তবে মুরগী চুরি করেছি?" এত করেও কিন্তু সরকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। ২৫শে ডিসেম্বর যুবরাজ কলকাতায় এসে দেখলেন মহানগরীর সে এক বিষাদ করুণ রূপ! সারা সহরের দোকানপাট বন্ধ, পথে ঘাটে লোকজন নেই, বাড়ীতে বাড়ীতে কালো পতাকা উড্ডীন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে ভারতবাসীরা ব্রিটিশ শাসনে সন্তুষ্ট নয়—তারা চায় স্বাধীনতা! ১৯২২এর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। এই সময় উত্তর-বঙ্গে প্রবল বন্যার ফলে বাংলার সমাজজীবনে নেমে এসেছিল এক দারুণ দৈব দুর্বিপাক। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু এই বন্যার ফলে গৃহহীন এবং জীবন ধারণের উপায়বিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বন্যার্তদের করুণ আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এই সময় বাংলার পরহিতব্রতী দেশসেবক বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতি গঠিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র তার সম্পাদক

নির্বাচিত হন। সরকারী সহায়তা ব্যতীতই এই সমিতির প্রচেষ্টায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং পরে সমিতির আর্তত্রাণ কার্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলা গবর্ণমেণ্টও ২০ হাজার টাকা সমিতিকে দান করেছিলেন। আর্তত্রাণকার্যে সুভাষচন্দ্র যে অদ্ভুত সংগঠনী শক্তি ও কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা দেখে বাংলার তৎকালীন গবর্ণর লর্ড লিটন পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দেই প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের নিখিল ভারত কংগ্রেসের জীবন আরম্ভ। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে গয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসে দুটি ভিন্ন দলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেস দু'বৎসর বৃটিশের সঙ্গে পুরোপুরি অসহযোগিতা করে এসেছে—তদনুযায়ী ১৯১৯এর শাসনসংস্কার অনুসারে নবগঠিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিকেও কংগ্রেস বর্জন করে চলেছিল। এইবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সমর্থন ও সহযোগিতায় ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেসের নির্বাচনে আইন-পরিষদগুলিও দখল করা উচিত এবং পরিষদের ভিতর থেকেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা উচিত। এর ফলে গয়া অধিবেশনে আইন-সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল গঠিত হয়। দেশবন্ধুর সহকারীরূপে সুভাষচন্দ্র গয়া অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্বরাজ্য দল গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। গয়া অধিবেশন থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্র 'বাঙ্গলার কথা' নামক একখানি বাংলা দৈনিক পত্র প্রকাশ

করেন। এই সময় দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলের আদর্শ জনসমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ফরওয়ার্ড' নামক ইংরেজী দৈনিক প্রত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সংবাদপত্র পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁরই স্কন্ধে 'ফরওয়ার্ডের' সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কারাবাসের সময় সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে একই কারাকক্ষে ছিলেন—ফলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক বেড়ে গিয়েছিল। এখন কার্যক্ষেত্রে সেই হৃদ্যতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র প্রাণপণ পরিশ্রম করেন এবং এই নির্বাচনে স্বরাজ্য দল কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে দেশবন্ধুর কাছে এবং দেশবাসীদের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের মর্যাদা ও গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘ বা Young Bengal Party নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম থেকেই কিরূপ চরমপন্থী ছিল এই দলের কর্মসূচী থেকে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের দৃষ্টিতে স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস ছিল সামর্থবোধক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ লাভ বা পরিপূর্ণরূপে বৈদেশিক শাসন-মুক্তি। তা ছাড়া এই বঙ্গীয় তরুণ সঙ্ঘের মারফৎ সুভাষচন্দ্র আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তাদের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে দেশবাসীদের সচেতন করে তুলেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গী যে বহু পূর্ব থেকেই প্রগতিশীল ছিল বঙ্গীয় তরুণ দল প্রতিষ্ঠাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল নবসংস্কৃত কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন এবং স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসী মেয়র নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী সুভাষচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব। বাংলা গবর্ণমেণ্ট অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর উগ্রপন্থী সুভাষচন্দ্রের নিয়োগ সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রধান কর্মসচিবের পদের বেতন ছিল মাসিক ৩ হাজার টাকা। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় এই বেতন কমিয়ে দেড় হাজার টাকা মাত্র গ্রহণ করতেন। সে দেড় হাজার টাকাও তাঁর ব্যয় হত গরীব ছাত্রদের ভরণ-পোষণে, তাদের বৃত্তিদানে, আর্তত্রাণে। ২৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ কর্মসচিব নিজের অদ্ভুত কর্মনৈপুণ্যে অবিলম্বেই জনসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক সহযোগিতার ফলে কর্পোরেশনের শাসন-ব্যবস্থা গেল সম্পূর্ণ পালটে—ইউরোপীয়দের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হল—খাদি এবং স্বদেশীর মন্ত্রে কলিকাতা কর্পোরেশন পেল নতুন জীবন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এই সর্বব্যাপী স্বদেশীর বিস্তারে ভয় পেয়ে গেল এবং এ জাতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হল। প্রথম আঘাত এসে পড়ল সুভাষচন্দ্রেরই উপর। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তিনি বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে ধরা পড়লেন। এইবার সুরু হল তাঁর বিনা বিচারের দীর্ঘ কারাবাস। তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল না যে তাঁকে বিচারার্থ উপস্থিত করা যায়। তাঁর মত আরও অনেক কংগ্রেস কর্মীকে এবং ব্যবস্থাপরিষদের স্বরাজ্যদলীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ সদস্যকেও

গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁদের বিনা বিচারে আটক রাখা হল। ব্যবস্থা পরিষদে এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বরাজ্যদল তখন সরকারী কাজে প্রবল বাধা দিচ্ছিল। তা ছাড়া এই জাতীয় সর্বব্যাপী গ্রেপ্তারের আর কোন কারণ আবিষ্কার করা যায় না। সরকারী পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বাংলায় তলে তলে অনুষ্ঠিত বিরাট বিপ্লবী ষড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটিত করার জন্যেই সরকার এ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সরকার পক্ষের এ উক্তি কোনদিন প্রমাণিত হয় নি। এই সময় কলিকাতার দুটি ইঙ্গ-ভারতীয় দৈনিক 'ইংলিশ-ম্যান' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' ক্রমাগত সুভাষ বিরোধী প্রবন্ধাদি বেরোচ্ছিল এবং এই পত্রিকা দুটি গবর্ণমেণ্টকে এই বলে উত্তেজিত করেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রই আলোচ্য বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পরিচালক—অতএব তাঁকে ধরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এতে কংগ্রেসী মহলে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং পত্রিকা দুটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনীত হয়। বেশ কিছুকাল ধরে এ মামলা চলেছিল। কিন্তু পত্রিকা দুটি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সরকারী কৃপাপরিপুষ্ট বলে শেষ পর্যন্ত তাদের কোন শাস্তিই হয় নি।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হওয়ায় কর্পোরেশনের কাজের খুবই অসুবিধা হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র যতদিন আলিপুর জেলে ছিলেন, ততদিন তাঁকে কর্পোরেশনের কাজ করার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেক্রেটারী রোজ গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জেলে স্থানান্তরিত করা হল। এখানে তিনি কয়েক মাস ছিলেন। বিনাবিচারে সুভাষচন্দ্রকে এ ভাবে কারারুদ্ধ

করায় সমগ্র দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কর্পোরেশনের সভায় সরকারী কাজের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমের দোষে দোষী—তিনি নিজেও সেই দোষে দোষী। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলে, একই অপরাধে তাঁকেও গবর্ণমেণ্টর গ্রেপ্তার করা উচিত। কোন দাবীতেই কাজ হল না। গবর্ণমেণ্ট ভাবলেন যে সুভাষচন্দ্রকে দেশ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিলে হয়ত বা দেশবাশীরা তাঁকে ভুলে যাবে—তাঁর মুক্তির জন্যে আন্দোলনও কমে যাবে। এই দুরাশায় সুভাষচন্দ্রকে সুদূর ব্রহ্মের মান্দালয় কারাগারে নির্বাসিত করা হল। তাঁর সঙ্গে আরও সাতজন রাজনৈতিক কর্মীও নির্বাসিত হলেন। সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়ে নির্বাসনের সংবাদ যখন তাঁর পিতামাতার কাছে পৌছুলো, তখন তাঁর দেশপ্রেমিক পিতা বলেছিলেন: "আমরা সুভাষের জন্যে গর্ব বোধ করি!"

কারাবাস যতই কঠোর হোক, দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ের বহ্নি-শিখা তাতো নির্বাপিত করতেই পারে না—বরং তাঁদের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম আরও ইন্ধন জোগায়। হিটলার নাকি একদা কারাগারে বসে বসেই জার্মান জাতির জন্যে বাঁচার স্থানের (Leben Sraum) পরিকল্পনা করেছিলেন। মান্দালয়ের নির্জন কারাবাসে বসে মাতৃভূমিকে বৈদেশিক কবল মুক্ত করার কামনাও তেমনই সুভাষচন্দ্রের মনে আরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মান্দালয় কারাগারে বন্দীদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এতে একটুও দমে যান নি। তিনি মান্দালয়ের কারাজীবন সম্বন্ধে লিখেছেন: "কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে পড়ছিল যে এই স্থানেই লোকমান্য তিলক প্রায়

৬ বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন এবং পরে লালা লাজপত রায়ও বছর খানেক আটক ছিলেন। তাই আমরা এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা ও গর্ব অনুভব করতাম যে আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলাম।" মান্দালয় বন্দী নিবাসে স্থানান্তরিত হবার কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজবন্দী অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তখন মান্দালয় কারাগারে বাঙ্গালী রাজবন্দীদের দুর্গাপূজার কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না কিংবা দুর্গাপূজার জন্যে কোন সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল না। এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন এবং পক্ষকাল ধর্মঘট করার পরেই কারাকর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। কারাকর্তৃপক্ষ কারাবন্দীদের প্রতি যে কত অবিচার করেন, বন্দীরা যে তাঁদের চোখে মানুষ বলেই বিবেচিত হয় না, এ বোধ সুভাষচন্দ্রকে সব সময়েই পীড়িত করত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মান্দালয় কারাগার থেকে শ্রীযুক্ত বসু তাঁর সতীর্থ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে কারাসংস্কার সম্বন্ধে তাঁর অনেক মতামত পাওয়া যায়। সেই পত্র থেকে বোঝা যায় যে রাজবন্দীদের চেয়ে সাধারণ কয়েদীদের দুর্ভোগ তাঁকে আরও বেশী ব্যথিত করে তুলত। এই সালেই সুভাষচন্দ্র কারাগারে একটা শোক-সংবাদ পান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র কারাগারে অসহায় বালকের মতই কেঁদে উঠেছিলেন। দেশবন্ধুকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করতেন না, অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পরলোকগত ঔপন্যাসিক ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'স্মৃতিকথা' নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ

লিখে তাঁর স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি পড়ে বন্দী সুভাষচন্দ্র এত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মান্দালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে একটী দীর্ঘ চিঠি লিখে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেন নি। এই চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তি ও প্রীতি ফুটে উঠেছে।

ইতিমধ্যে তাঁর মুক্তির দাবীতে বাংলার আকাশ বাতাস প্রতিনিয়তই মুখর হয়ে ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে দাবীতে কান দিচ্ছিলেন না। উপায়ান্তর না দেখে বাংলা কংগ্রেস এক নতুন চাল চালল। বন্দী সুভাষচন্দ্র বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হলেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিতও হলেন। অনেকে আশা করল যে এবার হয়ত তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু শীঘ্রই সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত হল। তাঁকে মুক্তিও দেওয়া হল না, বিচারের জন্য তাঁকে আদালতেও হাজির করা হল না। এদিকে মান্দালয় কারাবাসে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে লাগল। মান্দালয়ে কারাবাসের অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে মান্দালয় নরক বিশেষ। দীর্ঘ দুই বৎসর এই নরকবাসের ফলে ১৯২৭এর এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে পড়ল যে তাঁর বিছানা থেকে নড়বার সামর্থও রইল না। ডাক্তাররা একযোগে রায় দিলেন যে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সারা বাংলা আবার তাঁর মুক্তির দাবীতে মুখর হয়ে উঠল। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে একদল ডাক্তার প্রেরণ করা হল। তাঁর ভ্রাতা ডাক্তার সুনীলচন্দ্র

বসুও এই ডাক্তার দলের অন্যতম ছিলেন। তাঁর শরীরের ওজন তখন ৪০ পাউণ্ড কমে গেছে এবং ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তখন বিব্রত হয়ে সরকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হল যে সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে যান, এতে সরকারপক্ষের কোন আপত্তি নেই। তবে তাঁর নিজের ব্যয়ভার নিজেকে বহন করতে হবে এবং ভারতের কোন বন্দরে না থেমে তাঁকে সরাসরি রেঙ্গুন থেকে ইউরোপ যেতে হবে। সরকারপক্ষের এই সর্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে সুভাষচন্দ্র অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল থেকে ১৯২৭এর এপ্রিল মাসে তাঁর মেজদাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে যে পত্র লিখেছিলেন, সে পত্রখানি বিশেষ স্মরণযোগ্য। তাঁর মনের জলন্ত স্বদেশপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয় সম্মানবোধ এই পত্রখানির প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি স্পষ্ট জানান যে কোনপ্রকার সর্তাধীন মুক্তি নিয়ে তিনি নিজের জীবনকে বাঁচাতে চান না। এই অবস্থায় পড়ে তাঁকে ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া ছাড়া গবর্ণমেণ্টের গত্যন্তর থাকে না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তাঁকে রেঙ্গুন থেকে জাহাজযোগে ডায়মণ্ড হারবারে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে বাংলার গবর্ণরের লঞ্চে ওঠানো হয় এবং এই লঞ্চের উপরেই ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লেঃ কঃ স্যাণ্ডস এবং মেজর হাঙ্গষ্ট্যান প্রভৃতি চিকিৎসাবিদরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। সেদিন তিনি লঞ্চেই কাটান। পরদিন তাঁকে জানানো হয় যে তিনি নিঃসর্ত মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর মুক্তির সংবাদে সমগ্র বাংলায় আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি

ধরা পড়েন, তখন তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যোজ্বল তেজোদ্দৃপ্ত যুবক। তিন বৎসর পর বৃটিশ কারাগার থেকে যখন তিনি মুক্তি পেলেন, তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষয়রোগী।

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ বেশীদিন বিশ্রাম সুখ ভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙ্গলার রাজনৈতিক জীবনে যে শূন্যতা এসেছিল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তা কতকাংশে পরিপূরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তরুণ বাংলার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের উপর। সুতরাং মুক্তি পেতে না পেতেই দেশের যুবশক্তির আহ্বানে, তাঁকে কর্মসাগরে লাফিয়ে পড়তে হল। মুক্তির কিছু পরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯২৮-২৯ সাল সুভাষচন্দ্রের জীবনের কর্মবহুল দুটি বৎসর। এই বৎসর তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে সাইমন কমিশন ভারত ভ্রমণে আসেন। ৭।৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯১৯এর মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতবাসীদের আদৌ সন্তুষ্ট করতে না পারায় ব্যর্থ হয়েছে। তাই এ সাইমন কমিশনের প্রহসন। কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সারা দেশব্যাপী সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলন চলে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতায় এবং বাংলা দেশে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সর্বদলীয় সম্মেলন এবং

নেহেরু কমিটির অধিবেশন; এ দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা। কংগ্রেসী মহলে এই সময় একটা আপোষ রফার সুর স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। নেহেরু কমিটি যে শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচনা করেন তার মূল নীতি ছিল ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস লাভ। নেহেরু কমিটির এই রিপোর্ট লক্ষ্ণৌএ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি তরুণ নেতাদের নেতৃত্বে তরুণ ভারত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তাঁরা জানান পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ভারতবাসীদের মূল উদ্দেশ্য। তবে এই মতভেদ নিয়ে যাতে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয়, সেইজন্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থীদের যে ঘরোয়া বৈঠক হয় তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে নেহেরু কমিটি ও সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লীগ (Independence League) গঠিত হবে। এই ভাবে সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম কংগ্রেসের আপোষমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আপোষ আলোচনার ব্যর্থতার পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল সে আন্দোলন ১৯২৮ সালেই সুরু হয়। সাইমন কমিশনের আগমনে সারা দেশে তিনি যে জাগরণ দেখেছিলেন, বর্দোলীর কৃষকরা খাজনা বন্ধ করে যে গণ-জাগরণের পরিচয় দিয়েছিল, তার ফলে সুভাষচন্দ্রের ধারণা জন্মেছিল যে দেশ প্রস্তুত। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন যাতে আরম্ভ হতে পারে তদুদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের মে

মাসে সুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমে গিয়ে মহাত্মাজীকে দেশের পরিস্থিতি বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে রাজী হন নি। ১৯২৮ এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র পুণায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র সে সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বোম্বাইএর বামপন্থী পার্শী নেতা মিঃ কে, এফ, নরীম্যানের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত যুব সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র এ সম্মেলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৮ সালের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। মহারাষ্ট্র সম্মেলন থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্র এই উপলক্ষে বিরাট একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি, ও, সি, বা জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসার। আমাদের জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র-গঠিত এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সুভাষচন্দ্রের সামরিক সংগঠনী শক্তির প্রকৃত নিদর্শন। এদের সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ এবং সামরিক নিয়মানুবর্তিতা শেখানো হয়েছিল। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে অভ্যর্থনার জন্যে যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন সুভাষচন্দ্র করেছিলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে শোভাযাত্রার তুলনাও বিরল। এই অধিবেশনেই সর্বাংশে নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণের

জন্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর দল এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে থাকলেও দেশের যুবশক্তি ছিল এর বিরুদ্ধে। দেশের যুবশক্তি যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় গান্ধীজী সে সংবাদ রাখতেন। তাই তিনি একটা মাঝামাঝি আপোষের জন্যে একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনলেন। এই সংশোধিত প্রস্তাবের মূল কথা এই যে ১৯২৯ এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি নেহেরু শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করেন, তবে কংগ্রেস আবার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করবে। এতেও তরুণ দল সন্তুষ্ট হল না। সুভাষচন্দ্র একটি তীব্র বক্তৃতায় গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এমনই ভাবে কলিকাতার অধিবেশন সমাপ্ত হল।

এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে এক বৎসর সময় দেওয়া হল তাতে বিশেষ কাজ হল না। কেননা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নেহেরু শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আদৌ কোন উৎসাহ দেখালেন না। ১৯২৯ এর লাহোর কংগ্রেসের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। তীক্ষ্ণধী গান্ধীজী ঘটনা প্রবাহ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশে বামপন্থী যুবশক্তি ক্রমশই দানা বাঁধছে। কলিকাতা কংগ্রেসেই তিনি তার প্রমাণ পেয়েছিলেন। তারপর আহমেদাবাদ, নাগপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বহু যুব সম্মেলনও হয়ে গেল। গান্ধীজী বুঝলেন যে এ অবস্থায় লাহোর

অধিবেশনের জন্যে একজন বামপন্থী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত না করলেই নয়। তাই লাহোর অধিবেশনের জন্যে গান্ধীজীর নিজের নাম প্রস্তাবিত হলেও, তিনি জওহরলালকে আলোচ্য অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করার নির্দেশ দিলেন। এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "বামপন্থী বিরোধিতাকে পরাজিত করে কংগ্রেসের উপর তাঁর আগেকার অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব পুনঃসংস্থাপনের জন্যে মহাত্মাজীর পক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে জয় করা ছিল অত্যাবশ্যক···মহাত্মার দিক থেকে এ মনোনয়ন কুশলতারই পরিচায়ক, কিন্তু বামপন্থী দলের পক্ষে এ মনোনয়ন হল দুর্ভাগ্যের বিষয়—কেননা এই ঘটনা থেকেই মহাত্মা এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া আরম্ভ হল এবং ফলে শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কংগ্রেস বামপন্থী দলের ব্যবধানও বেড়ে চলল······এবং রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁর নিবাচন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। সেই থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মার বড় সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।"

লাহোর অধিবেশনের দুই মাস পূর্বে বড়লাট লর্ড আরউইন একটি ঘোষণায় বললেন যে ভারত ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস লাভ করুক—এটা তো বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মূল নীতি এবং ১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই একথা আছে। তিনি আরও একটি ঘোষণায় জানালেন যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক বসবে। এই ঘোষণার পরে দিল্লীতে আবার একটি সবদলীয় সম্মেলন বসল এবং এই সম্মেলনে স্থির হল যে বড়লাটের ঘোষণার অকৃত্রিমতায় বিশ্বাস করে ভারতের জন্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের

শাসনতন্ত্র রচনায় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হোক। এই ইস্তাহারে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল, জওহরলাল, মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজী, ডাঃ আনসারী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি। সুভাষচন্দ্র মোটেই এ ইস্তাহারের পক্ষে ছিলেন না। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কংগ্রেস সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাক। তিনি এই ইস্তাহারে সই করতে অস্বীকৃত হলেন এবং নিজে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বিরোধিতা করে একটি ভিন্ন ইস্তাহার প্রচার করলেন। সুভাষচন্দ্র ছাড়া এই ইস্তাহারে অমৃতসরের ডাঃ কিচলু, পাটনার অধ্যাপক আবদুল বারি প্রভৃতি সই করেছিলেন। এর কিছু পরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী ও মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎকার হল। কিন্তু কোন লাভজনক প্রস্তাব না থাকায় তাঁরা হতাশ চিত্তে শূন্যহাতে লাহোর কংগ্রেসে ফিরে এলেন। মহাত্মা গান্ধী লাহোর অধিবেশনে নিজে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলেন। ১৯২৯এর লাহোর অধিবেশন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। এর কিছুদিন পূর্বে বড়লাটের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিপন্মুক্তিতে অভিনন্দন জানিয়েও একটি প্রস্তাব স্বাধীনতা-প্রস্তাবের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থী তরুণ দল এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। তৎসত্ত্বেও প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। পূর্বেই বলেছি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বামপন্থী তরুণ নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

সুভাষচন্দ্র ১৯২৭ সালে মান্দালয় থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় লাহোর অধিবেশনে তিনি নতুন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ পড়েন। কলিকাতায় ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের যে স্বাধীনতার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল, লাহোর কংগ্রেসে তাই গৃহীত হল। লাহোর কংগ্রেসে একটি সংশোধনী প্রস্তাবে, সুভাষচন্দ্র আয়র্ল্যাণ্ডের সিন ফিনের (বিপ্লবী আইরিশ দল) আদর্শে ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবী করেন। তা ছাড়া তিনি কংগ্রেসের তরফ থেকে দেশের শ্রমিক মজদুর, কৃষক ও যুবশক্তি সংগঠনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। তাঁর প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ভোটে টেঁকে নি। সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "নিজের গুণ দিয়ে আমার প্রস্তাবের বিচার করার জন্যে দেশবাসীরা আরও বার মাস সময় পাবেন। এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই যে আমারই প্রস্তাব কিংবা এরই অনুরূপ অন্য কোন প্রস্তাব আগামী কংগ্রেসে গৃহীত হবে। একমাত্র অনুতাপের বিষয় এই যে ইত্যবসরে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তার ত আর উপায় নেই—কেননা রাজনৈতিক শিক্ষার গতি ধীর—বিশেষ করে যখন প্রায় সব প্রভাবশালী নেতার প্রভাবই থাকে বিপরীত পক্ষে।" সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংগঠনের প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ না করলেও, তিনি ১৪ বৎসর পরে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট গঠন করে তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপ বিশ্ববাসীদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। লাহোর কংগ্রেসের পরে সুভাষচন্দ্র সমগ্র দেশে আপোষবিরোধী

মনোভাব গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দেশের যুবশক্তি এবং শ্রমিক কৃষকদের সঙঘবদ্ধ করা ও জাগিয়ে তোলা হল তাঁর কাজ। তিনি এই সময় বলেছিলেন : "কাল যদি আমাদের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়াও হয়, তবু আমাদের কর্তব্য হবে আয়র্ল্যাণ্ডের মত আমাদের দেশের যুবশক্তিকে সাধারণতান্ত্রিক দলে গড়ে তোলা এবং স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন জাগিয়ে রাখা।"

লাহোর কংগ্রেস আরও একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কংগ্রেসে এই সময় প্রচুর দলাদলি ছিল। সুভাষচন্দ্র এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দুজনেই ছিলেন দেশবন্ধুর সুযোগ্য বিশ্বাসভাজন শিষ্য। দেশবন্ধু যখন দেহত্যাগ করেন, সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয়ে বন্দী। যতীন্দ্রমোহন বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে দাঁড়ান। তিনি একাধারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, ব্যবস্থাপরিষদে কংগ্রেস দলের দলপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। তা ছাড়া চরমপন্থী সুভাষচন্দ্রের তুলনায়, যতীন্দ্রমোহনের প্রতি কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের আস্থাও ছিল বেশী। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের প্রীতি ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর অত্যধিক। তাঁর জীবনে একাধিকবার তিনি তা প্রমাণিত করেছেন। তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর যতীন্দ্রমোহনের দলের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ও সঙঘর্ষ বাধতে লাগল। সে বৎসর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই নিয়ে বিরোধ বেধেছিল এবং মীমাংসার জন্যে লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। তখন ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মধ্যস্থ নিযুক্ত করার

প্রস্তাব করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাতে আপত্তি জ্ঞাপন করে জানান যে যদি পণ্ডিত মতিলালকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হয়, তবে তাঁর রায় তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও তিনি তা মেনে নেবেন। অবশেষে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহনের সঙ্গে একটা মোটামুটি আপোষ-রফা হয়েছিল। লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে কংগ্রেসের সভাপতি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন, এ রীতি গণতন্ত্র-বিরোধী বলে, গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নির্বাচন ব্যবস্থা করা হোক। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর দল এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করায় প্রস্তাবটি ভোটে হেরে যায়। দক্ষিণপন্থীদের এই গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর দলবল সহ সভামণ্ডপ ত্যাগ করে চলে যান।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র পর পর কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুভাষচন্দ্রের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে থাকার সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁর কার্যকলাপকে সব সময়েই ভীতির চক্ষে দেখতেন এবং তাঁকে কারাপ্রাচীরের আড়ালে আটকাতে না পারলে গবর্ণমেণ্টের যেন শান্তি হত না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ কলিকাতায় নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস (All India Political Sufferers' Day) উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র এক বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন। সেই জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে এক মামলা চলছিল। এই মামলায় ১৯৩০এর ২৩শে জানুয়ারী তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তিনি

আটক থাকেন। ২১শে এপ্রিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এইদিন আলিপুর জেল থেকে মেছুয়া বাজার বোমার মামলার আসামীদের বিচারার্থ আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কতগুলো অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়ে আসামীরা কয়েদীদের গাড়ীতে প্রবেশ করতে অসম্মত হন। এই সংবাদে সাধারণ পাঠান কয়েদী, জেল কর্তৃপক্ষ এবং ওয়ার্ডাররা ঘটনাস্থলে এসে জড় হন। সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি অন্যান্য রাজবন্দীরাও সেখানে এসে সমবেত হন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন জোর করে বোমার মামলার আসামীদের গাড়ীতে তোলার আদেশ দেন এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রাজবন্দীদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই অন্যায় বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁদেরও জোর করে অপসারিত করার আদেশ দেন। পাঠান কয়েদীরা একযোগে শ্রীযুক্ত বসু এবং তাঁর সঙ্গী অন্যান্য রাজবন্দীদের উপর লাফিয়ে পড়ে। লাঠির আঘাতে শ্রীযুক্ত বসু অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল তিনি অজ্ঞান ছিলেন। এই ব্যাপারে অপর কয়েকজন রাজবন্দীও আহত হয়েছিলেন। এই নিয়ে সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন চলে। গবর্ণমেণ্ট দোষক্ষালনের জন্যে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে না। সমগ্র বাংলাদেশে আলিপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজের তীব্র সমালোচনা চলে। বেচারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধ্য হয়ে অন্য জেলে বদলী হয়ে আত্মরক্ষা করেন। জেলে থাকার সময়ই শ্রীযুক্ত বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

এই বৎসর তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সভাপতিরূপে তিনি এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গভীর যোগাযোগ সংস্থাপন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি আলিপুর জেল থেকে মুক্তি পান এবং ১৯৩১এর জানুয়ারী মাসে মালদহ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ভঙ্গের দরুণ তিনি ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবস রূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ঐদিন নতুন করে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করা হয় এবং সভা ও শোভাযাত্রাদির অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতায় এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। পুলিশ এই শোভাযাত্রা অবৈধ ঘোষণা করে এবং শোভাযাত্রাকারীদের উপর লাঠি চালায়। অবৈধ শোভাযাত্রার পরিচালকরূপে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর ছয়মাস কারাদণ্ড হয়। কিন্তু শীঘ্রই গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পূর্বেই তিনি মুক্তি পান।

যখন কংগ্রেসের অংশ গ্রহণ না করার ফলে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন উদারনৈতিক নেতা স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং ডাঃ এম, আর, জয়াকর, গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে একটা আপোষরফার চেষ্টা করেন। ফলে গান্ধীজী যারবেদা জেল থেকে বিনাসর্তে মুক্তি পান এবং বড়লাটের সঙ্গে তাঁর যথারীতি সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়—যার নাম গান্ধী-আরউইন

চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে গান্ধীজী অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন এবং বিলাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। আর বড়লাট লর্ড আরউইন হিংসাত্মক কার্যের জন্যে কারারুদ্ধ এমন সব রাজবন্দী ছাড়া, অন্য সব রাজবন্দীকেই মুক্তি দিলেন। সুভাষচন্দ্রও মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাবার পরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর এই আপোষে চরমপন্থী নেতা রূপে তিনি খুসী হতে পারেন নি। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থনের জন্যে ২০শে মার্চ করাচীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। সুভাষচন্দ্র করাচী কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত নওজোয়ান সম্মেলন ও নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি গান্ধীজীর আপোষ-মূলক মনোভাব এবং আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মেও একটি বিবৃতি দেন যে দেশের সঙ্কটজনক অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলীর বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানো হয়। ফলে দুইজন রাজবন্দী নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। কারাকর্তৃপক্ষের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে ইস্তফা দেন। বাঙ্গলা কংগ্রেস নিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতভেদও

চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। ১৯৩১এর ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী বিলাতের গোলটেবিল বৈঠক থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসেন। ২৮শে ডিসেম্বর মহাত্মার অনুরোধে বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ১৯২৯ থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন না—একথা আগেই বলা হয়েছে। তবে তিনি বোম্বাইর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যে একটি বিশেষ আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে বোম্বাই যান। বোম্বাইর অধিবেশন শেষ করে ১৯৩২ এর ২রা জানুয়ারী তিনি যখন কলিকাতা ফিরছিলেন, তখন কল্যাণ রেলওয়ে ষ্টেশানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হন। তখন তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। তাঁকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সিউনি সাবজেলে রাখা হয়—পরে জব্বলপুর জেল, ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাস, লক্ষ্ণৌ-এর বলরামপুর হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভাবে এক বৎসর কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তখন একদল সরকারী স্বাস্থ্য-পরীক্ষক তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রায় দেন যে তাঁকে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে প্রেরণ করা কর্তব্য। বহু ভাবনা চিন্তার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ইউরোপ যাবার সম্মতি দেন। তদনুযায়ী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইউরোপে নির্বাসন

১৯৩৩ সালের ৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরীরে ভিয়েনা পৌঁছেন। ভিয়েনায় তিনি একটি স্বাস্থ্যাবাসে বাস করতে থাকেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় রাজনীতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ইটালীতে মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জার্মানীতে তখন গণতন্ত্রের অবসান হয়ে নাৎসীনায়ক হিটলারের অভ্যুদয় হয়েছে। সারা ইউরোপে তখন অসম্ভব কর্মচাঞ্চল্য। খাস অষ্ট্রিয়ায় তখন নামে ডাঃ ডলফাসের সাধারণতন্ত্র চললেও, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গ, মেজর ফে প্রভৃতি অষ্ট্রীয় ফ্যাসিষ্টদের হাতে। এঁদের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর গভীর যোগাযোগের কথা সুবিদিত। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপে পাঠিয়েও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শান্তি ছিল না। তাঁরা তাঁর গতিবিধিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভায় একটি প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছিলেন যে ইউরোপে সুভাষচন্দ্রের ভ্রমণের অবাধ অধিকার নেই এবং জার্মানীতে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তিনি কিছুকালের জন্যে ভিয়েনাতেই থেকে গেলেন। প্রসিদ্ধ পার্লামেণ্টারী নেতা শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলও ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে সেখানে ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম দেখে তিনি অতি শীঘ্রই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শ্রীযুক্ত প্যাটেলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং নিজের অসুস্থতা সত্বেও তাঁর কাছে সর্বদা থেকে যথাসাধ্য তাঁর শুশ্রূষা করতেন। শ্রীযুক্ত

বসু ইউরোপে পদার্পণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সাধারণ ইউরোপীয়রা ভারত সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখে না—আর যদিইবা রাখে তবে তারা ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তার কারণ হচ্ছে ভারত সম্বন্ধে বৃটিশদের ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার এবং আমাদের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোরও চেষ্টা করা হয় না। শ্রীযুক্ত প্যাটেলও এই নির্মম সত্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের পক্ষ থেকে বৃটিশ অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ না করলে, এ প্রকার অপপ্রচার বেড়েই চলবে। এই বৈদেশিক প্রচার-কার্যের উদ্দেশ্যেই তিনি মৃত্যুর পূর্বে সুভাষচন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে এক লক্ষ টাকা জাতিকে দান করে গিয়েছিলেন। বিদেশে বসেও সুভাষচন্দ্র পরাধীন ভারতের কথা ভুলতে পারতেন না। তিনি যখনই যেখানে যেতেন, তখনই সে দেশের সামাজিক আবহাওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতেন এবং নিজের দেশের সঙ্গে তুলনা করতেন। অষ্ট্রীয়ায় তখন নামে মাত্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন নেতৃত্ব করছে ফ্যাসিষ্টরা। প্রিন্স ষ্টারহামবার্গ এবং মেজর ফে ছিলেন তাদের নেতা। সুভাষচন্দ্র সাগ্রহ মনোনিবেশ সহ ফ্যাসিষ্টদের কার্যকলাপ, তাদের সামরিক বাহিনী সংগঠন প্রভৃতি লক্ষ্য করতেন। নিজে কলিকাতার মেয়র হয়েছিলেন বলে স্বায়ত্তশাসিত পৌরপ্রতিষ্ঠান-গুলোর কার্যকলাপ সম্বন্ধেও তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি সোস্থাল ডেমোক্রাটদের দ্বারা পরিচালিত ভিয়েনা সহরের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সুভাষচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত প্যাটেল জানতে পারলেন যে গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালানোর জন্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন। তখন প্রবাসস্থিত এই নেতৃদ্বয় একটি সংযুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে মহাত্মা গান্ধীর আপোষ-কামী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই বিবৃতির মূল বক্তব্য ছিল যে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখার অর্থ সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। তাই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে নতুন নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। আর কংগ্রেসকে একান্তই যদি ভেঙ্গে গড়া না যায়, তবে কংগ্রেসের মধ্যেই চরমপন্থী আপোষবিরোধী শক্তিপুঞ্জের একটা সুসংবদ্ধ উপদল থাকা আবশ্যক। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগের পূর্বে একাধিকবার নিজে এই উপদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। অষ্ট্রিয়ায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় গেলেও, সুভাষচন্দ্র কখনও বসে থাকতেন না। তিনি সময় এবং সুযোগ পেলেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং সেইসব দেশে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা হিসাবে প্রচুর সম্মান পেতেন। বিদেশে বৃটিশ প্রচারের ফলে ভারত সম্বন্ধে যেসব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সুভাষচন্দ্র সুযোগ পেলেই বক্তৃতার সাহায্যে, সংবাদপত্রে বিবৃতির মারফৎ সে সব ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করতেন। ভারতের পক্ষে এই প্রচার-কার্যে তিনি বিভিন্ন দেশস্থিত বৃটিশ কনসাল বা রাজদূতদের কাছ থেকে প্রবল বাধাও পেতেন। ১৯৩৩এর জুলাই মাসে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে গিয়েছিলেন এবং প্রাগের লর্ড মেয়র কর্তৃক বিপুলভাবে অভ্যর্থিত

হয়েছিলেন। ডাঃ বেনেস ছিলেন তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈদেশিক সচিব। তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়েছিল। প্রাগ থেকে ভিয়েনায় ফিরে তিনি দেখতে পেলেন যে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি তাঁকে নিয়ে 'নিয়ন' নামক স্থানে গেলেন। কিন্তু কিছু পরেই সেখানে শ্রীযুক্ত প্যাটেল দেহত্যাগ করলেন। তাঁর শব সুভাষচন্দ্রেরই প্রচেষ্টায় ভারতে প্রেরিত হয়েছিল এবং তিনি নিজে মার্সাই পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন। ফিরে এসে তিনি এবার সুইটজার্ল্যাণ্ডের জেনেভায় বাস করতে লাগলেন এবং তারপর কিছুকাল ফ্রান্সেও কাটিয়েছিলেন। এই সময় ইটালীতে একটি এশিয়াবাসী ছাত্র-সম্মেলন হয়। মুসোলিনি এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি ইটালীর রাজধানী রোমে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন এবং ইটালীর যুব-আন্দোলন সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি অন্যান্য বল্কান রাষ্ট্রও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। সর্বত্র তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী বয়ে নিয়ে যেতেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয়রা একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু তখন জার্মাণী ভ্রমণ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও ইংল্যাণ্ড, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বার ছিল তাঁর কাছে রুদ্ধ। বহু চেষ্টা করেও তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি মিলল না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর

লিখিত অভিভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই অভিভাষণেই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর 'সাম্যবাদ সঙ্ঘ' গঠনের প্রস্তাব করেন। তখন ইউরোপীয় রাজনীতি প্রায় দুটো ভাগে ভাগ 'হয়ে গেছে। একদিকে সোভিয়েট কম্যুনিজমের আদর্শ, অপর দিকে সারা ইউরোপভরা ন্যাৎসীবাদ আর ফ্যাসিজমের ছায়া। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'সাম্যবাদ সঙ্ঘে'র রাজনীতিতে এই উভয় মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলে গেছেন: "আমার নিজের মত এই যে আমরা আজ যে বিভিন্ন আন্দোলন দেখছি তাদের মধ্য থেকে উপকারী ও ভাল অংশটুকু বেছে নিয়ে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভারতের কাজ। এ উদ্দেশ্যে আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সব আন্দোলন ও গবেষণা চলছে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে আমাদের সেগুলি বিচার করতে হবে এবং নিজের মনের পূর্বজাত কোন কুসংস্কার বা ভাবপ্রবণতার জন্যে আমরা যদি কোন আন্দোলনকে অবহেলা করি, তবে তা মূঢ়তারই নামান্তর হবে।" এর কিছুকাল পরে নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র সংবাদ পান যে তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—তাঁর বাঁচার আশা কম। তখন তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি পিতাকে শেষ দেখার জন্যে ভারতে আসতে মনস্থ করেন। আর, কোন বিষয় একবার মনস্থির করে ফেললে সুভাষচন্দ্রকে বাধা দেওয়া হত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিমানযোগে ভারতে রওনা হলেন এবং ৩রা ডিসেম্বর করাচীতে এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু তার পূর্বদিনই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে গেছে। পিতাকে শেষ দেখা দেখবার সুযোগ তাঁর হল না। তিনি দমদমে এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তার উপর সরকার পক্ষ থেকে ৩৮।২,

এলগিন রোডে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার আদেশ জারী করা হল। তাঁকে ৭ দিনের মধ্যে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিয়েও একটি নোটিশ জারী করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত দেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে নিজের পরিবারের লোকজন ছাড়া বাহিরের অপর কোন লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পত্র বিনিময় প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়। এক কথায় বলা চলে তিনি স্বগৃহে বন্দী হয়ে থাকেন। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে পূর্বাপর অত্যধিক ভয় করতেন, এ তার অন্যতম প্রমাণ। দেশে কিংবা বিদেশে সুভাষচন্দ্রকে কোনখানে রেখেই যেন গবর্ণমেণ্ট নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। পিতৃ-শ্রাদ্ধের শেষে ১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় আবার ফিরে গেলেন ইউরোপের নির্বাসিত জীবনে। এইবার সুরু হল তাঁর নির্বাসিত জীবনের দ্বিতীয় ভাগ। নির্বাসিত জীবনের প্রথম ভাগে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি প্রচুর কাজ করেছিলেন একথা আমরা বলেছি। কিন্তু একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলা হয় নি। দুই বৎসর কাল ইউরোপে বাস করার সময় তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—গ্রন্থখানির নাম Indian Struggle 1920-34. এই গ্রন্থটিতে সুভাষচন্দ্রের পরিচিত ভারতীয় রাজনীতির ঘটনাবহুল ১৪ বৎসরের কৃতিত্ব ও অকৃতিত্বের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে আছে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণে ভারত সম্বন্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এই পুস্তকখানি ইংল্যাণ্ডের একটি উৎসাহী পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেন

কিন্তু শীঘ্রই বইখানির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। এ সম্বন্ধে বিলাতের পার্লামেন্টে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তদুত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর জানিয়েছিলেন যে পুস্তক খানিতে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হয়েছে বলেই, সে পুস্তকের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভারত থেকে ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ইটালীর নেপ্‌লস বন্দরে নামেন এবং রাজধানী রোমে কয়েকদিন কাটান। এই সময় আফগানিস্থানের নির্বাসিত আমীর আমানুল্লার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রোম থেকে তিনি ভিয়েনায় ফিরে যান এবং সেখানে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিছুদিন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে তিনি পুনরায় রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তিনি সংবাদ পান যে বাঙ্গলা কংগ্রেসে তাঁর নিজের অনুগামী দল এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অনুগামী দলের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষের ফলে বাঙ্গলার রাজনৈতিক অগ্রগতি বিপন্ন হয়েছে। তিনি বিদেশ থেকে তাঁর দলকে বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে আপোষরফা করার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। ইউরোপে নির্বাসন কালে সুভাষচন্দ্র যখনই যেখানে কোন প্রকারে তাঁর স্বদেশকে অপমানিত হতে দেখেছেন, তখনই তিনি তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভারত-বিরোধী প্রচার-কার্যের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা পূর্বেই বলেছি। এইখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। সুভাষচন্দ্র যখন ইউরোপে ছিলেন, তখন নাৎসী নায়ক হিটলার একটি বক্তৃতায় চূড়ান্ত জাতি-বিদ্বেষের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর

বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল যে শ্বেত জাতিপুঞ্জ কৃষ্ণাঙ্গ জাতিপুঞ্জের উপর আধিপত্য করার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। হিটলারের এই বক্তৃতায় সমগ্র পৃথিবীর কৃষ্ণকায় জাতিপুঞ্জের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সুভাষচন্দ্র একটি বিবৃতিতে হিটলারের এই ঘৃণ্য বক্তৃতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর বিবৃতি পড়ে হন্তদন্ত করে নাৎসীরা জানিয়েছিল যে ভারত কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে হিটলারের মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নাৎসীদের প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র আয়র্ল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন এবং আধুনিক আয়র্ল্যাণ্ডের জন্মদাতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আইরিশ বিপ্লবী দল এবং তার অধিনায়ক ডি ভ্যালেরার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ডাবলিনে নাগরিকবৃন্দের কাছ থেকে যথোচিত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। ডি ভ্যালেরার সঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা ছিল প্রধানতঃ আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা ঘটিত। একই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত আয়র্ল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যে আত্মিক যোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক।। সুভাষচন্দ্র ডি ভ্যালেরাকে জানিয়েছিলেন যে আইরিশদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরাধীন ভারতের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আর ডি ভ্যালেরার ভারতপ্রীতির কথা ত সর্বজনবিদিত। এই দুইটি দেশের মধ্যে গভীরতর সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র আইরিশ নেতাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন ভারতীয় ছাত্র ও অধ্যাপকদের আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা করে দেন। ডি ভ্যালেরা সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। ডি ভ্যালেরা ছাড়াও



সুভাষচন্দ্র কৃষি ও ভূমিবিভাগের মন্ত্রী, স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী, সিন ফিন দলের সভাপতি এবং রিপাব্লিকান দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। তাঁর আয়র্ল্যাণ্ড ভ্রমণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মৌ-এ ভারতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল। এ অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। দীর্ঘকাল বিদেশে নির্বাসিত সুভাষচন্দ্র স্বদেশে ফিরে এ অধিবেশনে যোগদান করুন, দেশবাসীদের মনে এ আগ্রহ ছিল প্রবল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দেশবাসীদের এ আগ্রহের কথা সুভাষচন্দ্রকে জানান এবং তাঁকে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারতে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে তিনি দেশে ফিরে যান। তাঁকে বলা হল যে তিনি ভারতে ফিরে গেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। ভিয়েনার বৃটিশ রাজদূত সরকারী অনুজ্ঞা জানিয়ে তাঁর উপর একটি নোটিশ জারী করেন। এ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দুটি মাত্র পথ ছিল—হয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে নেওয়া, নয়ত দেশবাসীদের ইচ্ছার সম্মান রেখে দেশে ফিরে গিয়ে বৃটিশদের হাতে বন্দী হওয়া। তিনি শেষোক্ত পথই বেছে নিলেন এবং অবিলম্বে 'কমটি ভার্ডি' নামে ইটালীয় জাহাজে চেপে স্বদেশে রওনা হলেন। ১৭ই মার্চ ভারতে রওনা হবার পূর্বে তিনি বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' নামক পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানে চিঠিটির অংশবিশেষ উধৃত করা হল:

"আমার শেষবারের কারাদণ্ড আইন ও ন্যায়ের দিক থেকে যথেষ্ট নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমি ভারতে ফিরে গেলে আমাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা তুলনাবিহীন। বৃটিশ আইন ভারতে এই ভাবেই চলবে কি না এবং নতুন শাসনতন্ত্র ভারতে যে বিস্তৃততর স্বাধীনতা নিয়ে আসবে, এ তারই পূর্বস্বাদ কি না —এ প্রশ্ন কি আমি করতে পারি?" তাঁর ভারতে ফিরে আসার সংবাদ বিদ্যুতের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১১ই এপ্রিল জাহাজটি বোম্বাই বন্দরে পৌঁছুলো। সুভাষচন্দ্রের দর্শনলাভের আশায় সমুদ্রতীরে সহস্র সহস্র নরনারী ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনি তীরে পা দিতে না দিতেই তাঁকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার করে আর্থার রোডের পুলিশ ফাঁড়িতে আটক রাখা হল। পরে তাঁকে যারবেদা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হল। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি বাণী দিয়ে গেলেন: "মুক্তির নিশান উড্ডীন রাখুন।"

তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ মুখর হয়ে উঠল। কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং গবর্ণমেণ্টের এই কাজ অত্যন্ত অবৈধ ও অন্যায় হয়েছে বলে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিও একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন। ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভায়ও তাঁর এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। বিনা

বিচারে সুভাষচন্দ্রকে এমনভাবে আটক রাখার পিছনে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকায় সরকারী কর্তৃপক্ষও বিব্রত হয়ে পড়লেন। কমন্স সভায় সহকারী ভারত সচিব অজুহাত দিলেন যে সুভাষচন্দ্র ভারতের অন্যতম প্রধান সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই তাঁকে ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সরকারী অজুহাতে গণমানসের সংশয় দূরীভূত হল না। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি দাবী করে সমানেই আন্দোলন চলতে লাগল। একদিকে জনমতের চাপ, অপর দিকে আর একটি ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্ট বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে যে সাধারণ নির্বাচন হল, তাতে কংগ্রেস বেশীর ভাগ প্রদেশেই বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হল। এই শাসনতন্ত্র চালু করে প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে হলে কংগ্রেসের সাহায্য অপরিহার্য। তাই ১৯৩৭এর মার্চ মাসে গবর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রের উপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

আবার কারাবাসের ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। কারামুক্তির পর তিনি কিছুকাল কলিকাতায় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন রইলেন। ৬ই এপ্রিল তাঁকে কলিকাতায় একটি বিরাট জাতীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। ২৫শে এপ্রিল তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় হিমালয়ের নিকটবর্তী ড্যালহৌসীতে বায়ুপরিবর্তনে গেলেন। সেখানে তিনি ডাঃ ধরমবীরের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। মাস পাঁচেক পরে শীতকালের সূত্রপাতে তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং চিকিৎসকদের উপদেশে পূর্ণ স্বাস্থ্য অর্জনের আশায় তিনি ১৮ই নবেম্বর তারিখে আবার ইউরোপ যাত্রা করলেন। এবার তিনি নির্বাসিত

নন—তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় ইউরোপে গেলেন। তিনি প্রথমে অষ্ট্রিয়ার বাদগাস্তিন নামক স্বাস্থ্যনিবাসে যান এবং সেখানে প্রায় দেড়মাস কাল থেকে ভালভাবে চিকিৎসা করান। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তিনি লণ্ডনে পৌছেন এবং সেখানে তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় জানান যে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করলেও ১৯৩৫এর ভারত শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয়ভাগের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব মেনে নেবে না। ১৯৩৮এর ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরা কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফ থেকে লণ্ডনে সুভাষচন্দ্রকে সংবাদ দেওয়া হয়। ২৪শে জানুয়ারী তিনি লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরে আসেন।

রাষ্ট্রপতি

সুভাষচন্দ্রকে অকস্মাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। সমগ্র দেশের জনগণ সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেস সভাপতিরূপে দেখতে চাইছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর সৈনিকের প্রতি দেশবাসীদের প্রীতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাঁর সভাপতিপদে নির্বাচন সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের মনে খুবই আগ্রহ থাকা ছিল স্বাভাবিক। কেননা ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পর আর কোন বাঙালী সভাপতি পদ পান নি। অথচ দেশবন্ধুর পরও বাঙ্গলা দেশে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের মত নেতা ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের যখন সভাপতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন অকস্মাৎ তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়া সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের মনে আগ্রহের অন্ত ছিল না। এ নিয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন যায় নি—এমনও নয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দেশবাসীদের সে ইচ্ছা পূরণ করলেন। সে বৎসর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে চার জন প্রার্থীর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল: শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং খান আবদুল গফফার খাঁ। এঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র এবং সীমান্ত গান্ধী ছাড়া অপর দুইজন নেতা একাধিকবার কংগ্রেস সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করেছেন। তাই তাঁরা নীরবে সরে দাঁড়ালেন। আর সীমান্ত গান্ধীকে বলা চলে ত্যাগের হিমালয়। কংগ্রেস সভাপতির পদ ভারতে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান। একাধিকবার এই শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান তাঁকে দিতে চাওয়া হয়েছে কিন্তু নীরব কর্মী সীমান্ত গান্ধীকে কিছুতে টলানো যায় নি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তিনি প্রতিবারই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এবারও তাই ঘটল। তিনি নীরবে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সরে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদানের পর থেকে তাঁর পরামর্শ নিয়েই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তিনি সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনই সমর্থন করলেন। ১৯৩৮ সালে গুজরাটের অন্তর্গত তাপ্তী নদীর তীরবর্তী হরিপুরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন হল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচিত সভাপতি এসে পৌঁছুলেন। সেবার কংগ্রেস-মণ্ডপের নামকরণ করা হয়েছিল পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের নামানুসারে বিঠল নগর। কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের প্রতীক হিসাবে সেবার কংগ্রেস-মণ্ডপের ৫১টি দ্বার নির্মিত হয়েছিল, ৫১টি জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস অধিবেশনে ৫১টি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়েছিল। তাছাড়া নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ৫১টি বলীবর্দবাহিত রথে করে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মোটকথা সেবার যেরূপ বিরাট সমারোহ ও উৎসবের মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল, সেরূপ খুবই কম দেখা যায়। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ নরনারী উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস

মন্ত্রিমণ্ডলী কাজ করছেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য অনেক মন্ত্রীও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিগত বৎসরের কাজের একটি বিবরণ পেশ করে নতুন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আসন গ্রহণের অনুরোধ করলেন। তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের সম্মুখে সেবার গুরুত্বপূর্ণ কাজও ছিল প্রচুর। একদিকে ইউরোপের ঘনায়মান যুদ্ধ পরিস্থিতি—অপর দিকে ভারতের অভ্যন্তরে কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট বিরোধ। কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করলেও সে বিরোধের অবসান হয়নি। দুইটি প্রদেশে—যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে—রাজবন্দীদের মুক্তিপ্রসঙ্গ নিয়ে গবর্ণরের সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের মত-বিরোধ দেখা দেওয়ায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁদের মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী দল চাইছিলেন যে এ ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিত্বই একযোগে ত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করুক।

১৯শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হল। বিপুল কর্মোন্মাদনা সুবিশাল জনস্রোতের মধ্যে হরিপুর যেন সেদিন নতুন করে প্রাণ পেল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দরবার গোপালদাস দেশাই একটি ছোট সুন্দর বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি এবং সমাগত অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানালেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি

বলেছিলেন : "আমরা এমন একজনের সভাপতিত্বের আশীর্বাদ পেয়েছি যাঁর স্বার্থত্যাগ, সেবা এবং লাঞ্ছনাভোগের ইতিহাস নিরবিচ্ছিন্ন। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমাদের সভাপতির সুনিপুণ নির্দেশে আমরা যেন লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের ইতিহাসে আরও গৌরবজনক অধ্যায় সংযোজনা করতে পারি।" এর পর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভাপতিরূপে তাঁর চমৎকার লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-সমন্বিত তার অভিভাষণটি হয়েছিল অপূর্ব। স্বদেশ এবং স্বজাতির গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিভাষণের প্রতি ছত্রে তা ফুটে বেরিয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তখন যুদ্ধের ছায়া এসে পড়েছে প্রায়। দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সুভাষচন্দ্র প্রচুর দূরদর্শিতা এবং বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হবার পর হরিপুরের কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কংগ্রেসের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ; একদিনের জন্যেও বিশ্রাম না নিয়ে তিনি কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্যে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ট্রেনে, মোটরে এরোপ্লেনে করে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সম্মুখে তখন বড় প্রশ্ন ছিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নতুন ভারত শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন। রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে অসংখ্য বক্তৃতা

এবং বিবৃতি দিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেস গ্রহণ করে নি বলে আজ পর্যন্ত বৃটিশদের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। রাষ্ট্রপতিরূপে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্যে সুভাষচন্দ্র লীগ-দলপতি মিঃ জিন্নার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না সাহেবের অযৌক্তিক দাবীর ফলে যেমনভাবে একাধিকবার গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনইভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। বিহারের অবিসম্বাদী জননেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র বিহার প্রবাসী বাঙালীদের দীর্ঘস্থায়ী কয়েকটি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পেরেছিলেন। ১৯৩৯ এর ২১শে জানুয়ারী দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার কয়েকদিন পূর্বে সুভাষচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করতে যান। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে স্বয়ং কবিগুরুর নেতৃত্বে তরুণ বাঙালী রাষ্ট্রপতিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। কবিগুরুর সস্নেহ সাদর সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ "আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি; কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই সব দিক দিয়ে আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র।"

১৯৩৯ সাল সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটা নাটকীয় বৎসর। কংগ্রেসের ইতিহাসেও এ বৎসরটি চিরস্মরণীয়। চরমপন্থী সুভাষচন্দ্রের

সঙ্গে গান্ধীবাদের যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ আছে—এইবারই তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হতে তিনি কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়া একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে একাধিক নেতার নাম প্রস্তাবিত হলেও, শেষপর্যন্ত একজনের অনুকূলে সকলেই নাম প্রত্যাহার করে থাকেন। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বরাবরই এ নীতির বিরোধী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গণতান্ত্রিক মতে নির্বাচিত হোক—এ ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। তিনি এই মর্মে কংগ্রেসে একবার একটি প্রস্তাব এনেছিলেন একথাও পূর্বে বলেছি। ১৯৩৯-এর নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে তিনটি নাম উপস্থাপিত হয়েছিল—মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল অন্ধ্রদেশের প্রাচীন কংগ্রেস নেতা ডাঃ সীতারামিয়াকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও গান্ধীজীর মনোভাব জেনে মৌলানা আজাদ যথাসময়ে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে একটি বিবৃতি দিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রার্থীপদ থেকে নাম প্রত্যাহার করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি স্থির করলেন যে দেশ ও জাতির জন্যে তিনি নির্বাচনে ডাঃ সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যে কোন কারণেই হোক তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল যে গান্ধীপন্থী বা দক্ষিণপন্থীরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চান বলেই তাঁরা একজন দক্ষিণপন্থীকে রাষ্ট্রপতির পদে বসাতে চান। এই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্যেই তিনি চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে মনস্থির করলেন। মৌলানা আজাদের বিবৃতির পর তিনি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে দেশবাসীদের জানালেন: "মিথ্যা আনুগত্যবোধকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কেননা সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় ভারতেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তবু যদি মৌলানা আজাদের মত প্রতিষ্ঠাবান নেতার আবেদনের ফলে বেশীর ভাগ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, আমি তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে একজন সাধারণ সৈনিকের মত আমার দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করব।" ১৯৩৯-এর রাষ্ট্রপতিত্ব নিয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ বেধে গেল। তিনি তাদের আপোষকামী আখ্যা দেওয়ায় তাঁরা যেন আরও বেশী চটে গেলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য প্রকাশ্যে ডাঃ পট্টভির অনুকূলে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। এইবার উভয় পক্ষ থেকে সুরু হল বিবৃতি প্রতিবিবৃতির ঝড়। ২৯শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা। তার চারদিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রায় দশটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজা করলেন গান্ধীজী। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদ্বয়ের কারও পক্ষ সমর্থন করেই কিছু বললেন না। কাজেই প্রতিনিধিরাও তাঁর মনোভাব টের পেলেন না। নির্বাচনের শেষে অবশ্য বোঝা গেছিল যে তাঁর মৌন সমর্থন ছিল ডাঃ পট্টভি

সীতারামিয়ার উপর। একথা যদি তিনি আগে জানাতেন তবে নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ডাঃ পট্টভি হয়ত হারতেন না। বিভিন্ন বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে ১৯৩৯-এর ২৯শে জানুয়ারী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্ব শেষ হল। ভোটগণনা হলে দেখা গেল যে সুভাষচন্দ্র ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে ভোট-যুদ্ধে পরাস্ত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১৫৮০ এবং ডাঃ সীতারামিয়া পেয়েছিলেন ১৩৭৭ ভোট। নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর পুনর্নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হল। নির্বাচনে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে গান্ধীবাদী নেতাদের যেরূপ বিরোধিতা হয়েছিল, তাতে তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল যে এ নিয়ে কংগ্রেসে বিরোধ বাধবার সম্ভাবনা। তাই তিনি খব উল্লসিত হয়ে উঠতে পারেন নি। যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তাই হল। সুভাষচন্দ্র যেমন এ নির্বাচনকে নীতির দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজীও তেমনই নীতির দিক থেকেই একে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের অর্থাৎ তাঁর মতবাদের পরাজয় বলে গ্রহণ করলেন। বার্দৌলী থেকে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন: "নির্বাচন দ্বন্দ্ব থেকে মৌলানা সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি—অতএব এ পরাজয় তাঁর চেয়ে আমারই অধিক!" গান্ধীজীর এই ক্ষোভোক্তিতে নির্বাচক কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বুঝতে

পারলেন যে নির্বাচনের পূর্বে মুখ না খুললেও গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থন ছিল, ডাঃ সীতারামিয়ার প্রতি। গান্ধীজীর এই বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতের রাষ্ট্রগুরুর আশীর্বাণী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেও চাকা ঘুরে গেল। আলোচ্য বিবৃতিতে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যখন দক্ষিণপন্থী বা গান্ধীপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে এত অনাস্থাশীল, তখন তিনি যেন শুধু বামপন্থীদের নিয়ে একটি একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তোলেন। তাতে তাঁর কাজের সুবিধা হবে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের বিজয়কে নিজের পরাজয় বলে গ্রহণ করায় দেখা গেল যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভোটাধিক্যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই। গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে যে কংগ্রেস চলতে পারে না কিংবা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ব্যক্তি বিশেষ গান্ধীনীতিকে বর্জন করতে পারে না একথা ভালভাবে প্রমানিত হল।

গান্ধীজীর বিবৃতি পড়েই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে নির্বাচনের মুখে আপোষকামী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর বিভিন্ন উক্তি এবং তৎপরে তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে শীঘ্রই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান রচিত হতে পারে। এই দুর্দৈব যাতে না আসতে পারে তার জন্যে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি হন্তদন্ত করে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ছুটে গেলেন ওয়ার্ধায়—গান্ধী-সন্দর্শনে। গান্ধীজীর সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনার পর তাঁদের দুজনের মধ্যে কি স্থির

হয়েছিল তা জানা যায় নি। কিন্তু ওয়ার্ধা থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্র যখন ১০৩ ডিগ্রী জ্বরে শয্যাশায়ী তখন হঠাৎ জানা গেল যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন দক্ষিণপন্থী সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। এটা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। পদত্যাগী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সীতারামিয়া এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী। যখন পদত্যাগের সংবাদ নিয়ে এ টেলিগ্রাম এল তখন রাষ্ট্রপতি তাঁর কলিকাতার বাড়ীতে প্রবল জ্বরে প্রায় হতচৈতন্য। দক্ষিণপন্থীদের এই অসহযোগ নীতিতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁরা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সে শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেল। এদিকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের মাত্র দুই এক সপ্তাহ বাকী। অথচ রাষ্ট্রপ্রতির স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক। একটু সুস্থ হবার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র আলোচ্য বারো জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। না করে তাঁর পক্ষে উপায়ান্তর ছিল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পদত্যাগকারী সদস্যেরা বেশ ভেবে-চিন্তেই একাজ করেছিলেন। তিনি যদি তাঁদের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন, তাতে কোন কাজ হবে না। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম বার্ষিক অধিবেশন হল। এ অধিবেশনও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ৫২টি হস্তীবাহিত রথে করে বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে কংগেসনগরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু পণ্ড হয়ে

গেল রাষ্ট্রপতির অসুস্থতার জন্যে। তাঁর চিকিৎসকরা তো তাঁকে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসী সুভাষচন্দ্র কোন নিষেধই কানে তুললেন না। তিনি অসুস্থ শরীরে অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ীতে ৬ই মার্চ নিঃশব্দে ত্রিপুরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর বদলে তাঁর বিরাট একটি প্রতিমূর্তিকে হস্তীবাহিত রথে স্থাপন করে শোভাযাত্রা বের করা হল।

গান্ধীজী প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিলেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগ দেন নি। যখন ত্রিপুরী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তিনি দেশীয় রাজ্য রাজকোটে আমরণ অনশন করছেন। তাঁকে নিয়ে দেশব্যাপী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। গান্ধীজীর রাজকোট অনশনের কারণ রাজকোটের শাসনকর্তা ঠাকুর সাহেবের চুক্তি-ভঙ্গ। ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা তিনি পালন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অনুরোধ উপরোধও যখন তিনি শোনেন নি, তখন গান্ধীজী আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠাকুর সাহেবের চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে ৫ই মার্চ নিখিল ভারত রাজকোট দিবস প্রতিপালিত হয়েছিল। এদিকে যখন এই অবস্থা ত্রিপুরীতে তখন অন্য নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ভোটাধিক্যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সহসা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁর সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নন—সেখানে দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাবে গান্ধীবাদে কংগ্রেসের আস্থা পুনর্জ্ঞাপন করলেন। এই

প্রস্তাবে বলা হল যে কংগ্রেস এপর্যন্ত গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই কংগ্রেস কর্মকর্তা পরিষদের উপর গান্ধীজী যাতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল থাকতে পারেন, সেজন্যে রাষ্ট্রপতি যেন মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করেন। সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের বিরোধিতা ও সংশোধনী প্রস্তাব সত্ত্বেও এই প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। এমনই ভাবে নির্বাচিত সভাপতির স্বাধীন সত্তাকে সুদৃঢ় নিয়মের নিগড়ে বেঁধে দেওয়া হল।

দুদিন পরে ১০ই মার্চ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হল। তার পূর্বে রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সহসা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। জব্বলপুরের সাহেব সিভিল সার্জেন তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে অবিলম্বে তাঁর চিকিৎসার জন্যে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত। কিন্তু সম্মুখের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে তিনি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজী হলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর স্বাস্থ্যের উদ্বেগজনক অবস্থা দেখে তাঁকে হাসপাতালে যাবার অনুরোধ করায়, স্বাধীনতার এই বীর সৈনিক জবাব দিয়েছিলেনঃ "আমি জব্বলপুরের হাসপাতালে যাবার জন্যে এখানে আসি নি। অধিবেশন শেষ হবার পূর্বে কোথাও স্থানান্তরিত হবার চেয়ে আমি এখানে মরাই বেশী পছন্দ করি!" এ সংকল্পের বিরুদ্ধে আর কথা চলে? কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনেও পন্থ প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। যে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি এতদিন সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে আসছিলেন, শেষ মুহূর্তে তাঁরাও সরে দাঁড়ালেন। এমনইভাবে ত্রিপুরী অধিবেশন শেষ হল।

সুভাষচন্দ্র পন্থ প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভাবলেন যে তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করবেন। দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। কাজেই তাঁর পক্ষে ওয়ার্ধায় গিয়ে মহাত্মাজীর সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়ে উঠল না। এই ভাবে কংগ্রেসে একটা সাময়িক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল এবং তার জন্যে তাঁকে লোকনিন্দাও কম সহ্য করতে হল না। অবশেষে তিনি ২৮শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করলেন। কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এই ঐতিহাসিক অধিবেশন হল। দক্ষিণপন্থীরা ত্রিপুরীর মতই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। গান্ধীজীও এই অধিবেশন উপলক্ষে এসেছিলেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র যখন বুঝলেন যে তাঁদের সঙ্গে আপোষরফা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, তখন তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিলেন যাতে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হতে না পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে অনুরোধে কাজ হল না। তার কারণ সুভাষচন্দ্র যখনই কোন বিষয়ে একবার মনস্থির করে ফেলতেন, তখন সে বিষয় থেকে তিনি এক ইঞ্চিও নড়তেন না। ফলে সুভাষচন্দ্রের স্থলে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন ক্রমে তিনি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে এবং পরে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন।

বিদ্রোহ, ফরওয়ার্ড ব্লক ও নিরুদ্দেশ

রাষ্ট্রপতির পদে সুভাষচন্দ্র ইস্তফা দিলেন বটে—কিন্তু তিনি হাত পা গুটিয়ে বসে রইলেন না। নিখিল ভারত কংগ্রেসে তাঁর মতাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও সুভাষচন্দ্র বুঝলেন যে দেশের একটা বিরাট অংশ তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলে। তিনি স্থির করলেন যে তাঁদের সবাইকে তিনি কংগ্রেসের অধীনে একটি বামপন্থী উপদলে সঙ্ঘবদ্ধ করবেন। তারই ফলে তাঁর পদত্যাগের কিছুদিন পরেই জন্ম নিল ফরওয়ার্ড ব্লক। তিনি প্রথমে ফরওয়ার্ড ব্লককে কংগ্রেস-বিরোধী ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মতই একটা উপদল হিসাবে কংগ্রেসের মধ্য থেকে কাজ করে যাবে। সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনের রাজনৈতিক আদর্শকে গান্ধীজী-প্রভাবিত কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে পারেন নি। সেই রাজনৈতিক আদর্শকেই তিনি রূপ দিতে চাইলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের মারফৎ। জনগণের কল্যাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের মূল উদ্দেশ্য। নিজের দলের রাজনৈতিক মতামত প্রচারের সুবিধার জন্যে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকও প্রকাশিত করলেন। বেরুতে না বেরুতেই পত্রিকাখানি জনসমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অনেকের মনে ধারণা আছে যে বোধ হয় ত্রিপুরী কংগ্রেসের

ব্যর্থতার ফলেই সুভাষচন্দ্রের মনে ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টির তাগিদ এসেছিল। কার্যত কিন্তু তা সত্য নয়। এই জাতীয় একটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামশীল দল গঠনের পরিকল্পনা বরাবরই তাঁর মনে ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর থেকেই আমরা দেখে এসেছি যে যা-কিছু প্রচলিত বলেই তিনি তাকে স্পষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা তাকে তুলিত করে তবেই তা গ্রহণ করতেন। এজন্যে তাঁকে বারবার করে কংগ্রেসের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। কোন লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন—কোনটায় বা হয়েছেন পরাজিত। কিন্তু তাঁকে কখনও উদ্যমহীন হতে আমরা দেখি নি। যাঁরা মনে করেন যে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে বারবার করে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করতেন, তাঁরা ভুল করেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে তিনি দেশের স্বার্থকেই বড় করে দেখতেন। যখনই তাঁর মনে হত যে কংগ্রেসের নীতি আপোষরফার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই তিনি কম্বুকণ্ঠে বিপ্লবের বাণী উচ্চারণ করতেন।

নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে সুভাষচন্দ্র ঘূর্ণি বায়ুর মত ভারত ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন এবং সর্বত্র আপোষ-বিরোধী বাণী প্রচার করতে লাগলেন। ইউরোপে তখন আসন্ন মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ বোধ থাকায় তিনি বুঝেছিলেন যে এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ভীষণ ভাবে বিজড়িত হয়ে পড়বে এবং সেই সুযোগে সংগ্রাম করে ভারতকে তার

প্রাপ্য স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব আপোষরফার পথে চলেছে এবং জনসাধারণ যেন তার দ্বারা ভ্রান্ত না হয়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই সব কংগ্রেস-বিরোধী উক্তিতে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ১৯৩৯-এর ২৪শে জুন বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয় এবং সে অধিবেশনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবের বক্তব্য ছিল যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ ব্যতীত কেউ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্বন্ধের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এ দুটি প্রস্তাবের একটিও বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে প্রস্তাব দুটি কার্যকরী হলে কংগ্রেস বিপ্লবের পথ থেকে শাসনতান্ত্রিকতার পথে এগিয়ে যাবে। তিনি তাঁর অনুবর্তী কংগ্রেসসেবীদের আলোচ্য প্রস্তাব দুটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। সুভাষচন্দ্রের এই শৃঙ্খলাভঙ্গে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ১১ই আগষ্ট তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তিন বৎসরের জন্যে বিতাড়িত করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তার পূর্বে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার ফলে বাংলার রাজনীতিতে নতুন সঙ্কট দেখা দিল। তিনি তখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বাংলা কংগ্রেসের উপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি

পদ থেকে অপসারিত হলেন এবং তাঁর পরিবর্তে নতুন সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হল। পরলোকগত রাজেন্দ্র দেব সভাপতি নির্বাচিত হলেন কিন্তু তিনিও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব ও নির্দেশ মেনে চলবেন বলে ঘোষণা করলেন। ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা কংগ্রেসকে বাতিল করে দিলেন এবং তার স্থানে একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন করে বাংলায় কংগ্রেসের কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করলেন। এমনই ভাবে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসের যে অন্তর্বিরোধ মিটে গেছিল, তা আবার নতুন করে দেখা দিল। বাংলার ব্যবস্থা পরিষদেও কংগ্রেস সদস্যদের দুটো দল হল—সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা তাঁর অগ্রজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব মেনে চলতে লাগলেন, আর অ্যাড হক কংগ্রেস কমিটির অনুবর্তী আইন সভার সদস্যরা মেনে নিলেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্ব। অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র গৌহাটি ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। এই মাসেই তিনি নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তিনি দিল্লীতে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায় বিশ্ববিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হল। ইংল্যাণ্ড প্রকৃতই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং সুভাষচন্দ্রের আপোষ-বিরোধী সুর আরও চড়া হয়ে উঠল। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র সারা ভারতে অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। বাংলায় ত তাঁর অবিসম্বাদিত প্রভাব

ছিলই—ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তিনি অনেক সুযোগ্য সহকর্মী পেয়েছিলেন। তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করেও তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর চরিত্রে যে সহজাত নেতৃত্ব ছিল, তার ফলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন বিহারের শ্রমিক নেতা স্বামী সহজানন্দ, পাঞ্জাবের সর্দার শার্দূল সিং কবিশের, মধ্যপ্রদেশের হরিবিষ্ণু কামাথ, শীলভদ্র যাজী প্রভৃতি। ১৯৪০ এর প্রথম ভাগে সুভাষচন্দ্র স্থির করেন যে তিনি কলিকাতায় একটি কংগ্রেসভবন স্থাপন করবেন। উপযুক্ত একটি কংগ্রেস ভবনের অভাব কলিকাতাবাসীরা বহুদিন থেকেই অনুভব করে আসছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেই অভাব মোচনে মনোনিবেশ করেন এবং উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করে এই ভবনের স্থান সংগ্রহ করেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এর নামকরণ করেছিলেন মহাজাতি সদন। সুভাষচন্দ্রের অভাবে তাঁর আরব্ধ মহাজাতি সদনের কাজ আর এগোয় নি—আজও সে কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। নেতাজীর সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার ভার কি অন্য কোন বাঙালী নেতা গ্রহণ করতে পারেন না?

যুদ্ধারম্ভের কিছু পরেই কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তাঁদের যুদ্ধাদর্শ সম্বন্ধে এবং এ যুদ্ধে যোগ দিলে ভারতের স্বাধীনতা মিলবে কি না সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা চায়। প্রার্থিত ঘোষণা না মেলায় একযোগে ৭টি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট তখন একটির পর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে দেশের বুক থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লুপ্ত করে দেবার চেষ্টা করেন। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বত্র গবর্ণমেণ্টের এই দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে জনগণের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। মার্চ মাসে তিনি সমগ্র যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং এ বৎসর মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রামগড়েই পাশাপাশি আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। এই উভয় অনুষ্ঠানই যাঁরা চোখে দেখেছিলেন তাঁরা বলেন যে সুভাষচন্দ্রের আপোষবিরোধী সম্মেলন, জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে কোন দিক দিয়েই হীন হয় নি এবং তাঁর সম্মেলনে লোকও হয়েছিল অগণিত।

এদিকে ইউরোপের যুদ্ধ তখন পুরো দমে চলছে—হিটলার একটির পর একটি করে ক্ষুদ্র দেশগুলোকে গ্রাস করে চলেছেন। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি সারা দেশে সংগ্রামের আহ্বান কণ্ঠে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে গান্ধীজীর সুবিখ্যাত Quit India প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন, সে সংগ্রামের জন্যে তাঁরা তখনও তৈরী ছিলেন না। তাই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের স্পষ্ট মতবিরোধ দেখা দিল। তাঁরাও সুভাষচন্দ্রের হঠকারী সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার সুরু করলেন। কংগ্রেস তার সমস্ত সংহত শক্তি

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার সেই সময় একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের নৌকা ফুটো (Leaky boat); সে নৌকায় 'স্বাধীনতা-সমুদ্রে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করলে জাতি সমুদ্রের মধ্যেই ডুবে মরবে। আর অভিজ্ঞ প্রবীণ গান্ধীজীর নৌকা নিরাপদ ও মজবুত; জাতি যদি গান্ধীজীর নৌকায় পাড়ি জমায়, তবে আকাঙ্খিত স্বাধীনতা তাদের জুটবে।

১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডার-ম্যান নিযুক্ত হন এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে কর্পোরেশনের ব্যাপারে মুসলিম লীগ ও সুভাষচন্দ্রের অনুবর্তী কংগ্রেস দলের মধ্যে একটা আপোষরফা হয়। জুন মাসে তিনি মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ২০শে জুন তিনি ওয়ার্ধা গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় দেশবাসীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উভয়েয় মধ্যে আলোচনা হয়। এই সাক্ষাৎকারের দুদিন পরে মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্না এবং হিন্দুমহাসভার নেতা বীর সাভারকরের সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হয়। এর পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ড্যালহৌসী স্কোয়ার থেকে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্যে আন্দোলন সুরু করেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ড্যালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থিত এই মনুমেণ্টটি আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক স্বরূপ ছিল। বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ই এই মনুমেণ্টটিকে

অপসারিত করতে চাইলেও, দুই একবার ব্যবস্থা পরিষদে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া, এটি অপসারণের জন্যে কোন চেষ্টাই করা হয় নি। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার নামে নৃশংসতার কলঙ্ক আরোপের জন্যে লর্ড কার্জন 'অন্ধকূপ হত্যা'র স্মারকচিহ্ন রূপে এই হলওয়েল মনুমেণ্টটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে পরে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অন্ধকূপ হত্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইতিহাসের বিরুদ্ধ রায় সত্বেও শাসক সম্প্রদায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত করে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। তাই সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ এর ২৯শে জুন তারিখে কলিকাতার হিন্দু মুসলমানদের একটি মিলিত সভায় ঘোষণা করলেন যে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্যে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করল এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। সে সময়ে বাংলা দেশে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসেছিলেন মৌলবী এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ। জুন মাসের মাঝামাঝি লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে জানানো হয়েছিল যে তাঁরা যদি অবিলম্বে জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের ব্যবস্থা না করেন, তবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবে। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের তরফ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়। ২৯শে জুনের সভায় স্থির হয় যে ৩রা জুলাই সিরাজ-স্মৃতি দিবসে হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে। তৎপূর্বে ২রা জুলাই তারিখে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সুভাষচন্দ্রকে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী গ্রেপ্তার

করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক করে রাখা হল। সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠল এবং কেউ এই সরকারী খামখেয়ালের কারণ নির্ধারণ করতে পারল না। ১ই জুলাই তারিখে কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ভারতসচিব আমেরী সাহেব ঘোষণা করলেন যে হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সত্যাগ্রহের নেতা এ ভাবে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হলেও সত্যাগ্রহ বন্ধ রইল না। নির্ধারিত দিনে হাতুড়ি হাতে নিয়ে সত্যাগ্রহীরা ড্যালহৌসী স্কোয়ারে হলওয়েল মনুমেণ্টের সন্নিকটবর্ত্তী হলেন এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। এমনই ভাবে দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ চলল। অবশেষে জনমতের চাপে পড়ে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ড্যালহৌসী স্কোয়ার থেকে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত করতে বাধ্য হলেন।

এ দিকে সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দেবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। ৩০শে আগষ্ট তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে দুটি মামলা দায়ের করা হল। দুটি মামলাই রাজদ্রোহের—একটি এপ্রিল মাসে মহম্মদ আলী পার্কে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার জন্যে, অপরটি ফরওয়ার্ড ব্লকে প্রকাশিত 'The day of Reckoning' নামক প্রবন্ধের জন্যে। তার পর দিন আলিপুরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রের এজলাসেও তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি মামলা দায়ের করা হল। বাংলার জনগণ সুভাষচন্দ্রকে কত ভালবাসতেন তার নতুন প্রমাণ পাওয়া গেল অক্টোবর মাসে যখন কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি উপনির্বাচনে বিনা বাধায় সদস্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু

তবু তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল না। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ছিল। বিনা বিচারে তাঁকে এই ভাবে আটক করে রাখায় সুভাষচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দেশবাসীরা তাঁর মুক্তির জন্যে বহু আন্দোলন করল—কিন্তু কোনই ফল হল না। তখন ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্র এই সরকারী খামখেয়াল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যে অনশন-ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করলেন। ২৬শে নবেম্বর তারিখে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও দাবী জানিয়ে বাংলার গবর্ণর, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলের কাছে একটি স্মরণীয় চিঠি লিখলেন। তিনি নিজে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটিকে তাঁর "রাজনৈতিক দলিল" বলে উল্লেখ করে গেছেন। এতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন: "অনুষ্ঠিত অন্যায়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা, অন্যায় করার চেয়েও ঘৃণ্য অপরাধ। কাজেই প্রতিবাদ আমি করবই।······প্রতিবাদের উপায় আছে মাত্র একটি—বন্দীর হাতে শেষ অস্ত্র—অর্থাৎ অনশন ধর্মঘট বা উপবাস।" সুভাষচন্দ্র স্থির করেছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁর দাবী মেনে না নিলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। এই চিঠিতেই দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে তিনি বলেছিলেন: "দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে আমি বলি—'ভুলো না যে মানুষের পক্ষে ক্রীতদাসরূপে থাকাই সব চেয়ে বড় অভিশাপ। ভুলো না যে অন্যায় ও ভ্রান্তির সঙ্গে আপোষ করা ঘৃণ্যতম অপরাধ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি স্মরণ রেখো—যদি পেতে চাও, তবে তোমাকে দিতে হবে। স্মরণ রেখো যে মূল্য যাই দিতে হোক না কেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সব চেয়ে বড় কাজ।"

বাংলা গবর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রের চিঠি দেখে বুঝতে পারলেন যে এ চিঠি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে লেখা হয় নি—লেখা হয়েছে সুদৃঢ় অভিমত জ্ঞাপনের জন্যে। তবু আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করার পূর্বে মুক্তি দিলেন না। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি যখন প্রকৃতই ধর্মঘট সুরু করলেন, এবং দেশব্যাপী তাঁর মুক্তির দাবী উঠতে লাগল, তখন আর তাঁরা চুপ করে থাকতে পারলেন না। অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করার পাঁচ সাতদিন পরেই ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও স্থগিত রাখা হল।

মুক্তি পেয়ে তিনি তাঁর এলগিন রোডের বাসায় এসে উঠলেন। এর পর রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের একাধিক বিবৃতির প্রত্যুত্তর তিনি দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি আর কোন রাজনৈতিক কার্য-কলাপে হাত দেন নি। নিজের গৃহ থেকে অকস্মাৎ উধাও হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় একা একাই কাটাতেন। বাইরের লোকের সঙ্গে ত দেখা করতেনই না—নিজের পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও বড় বেশী দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। ১৯৪১এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক থেকে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন এবং প্রধানত ফলমূল খেয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবনই তিনি যাপন করতেন। তাঁর ঘরে প্রবেশের অধিকার কারও ছিল না। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁরা সুভাষ-চন্দ্রের এই আকস্মিক ভাবান্তরে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তখন তাঁরা জানতেন না যে তাঁদের জন্যে আরও বিস্ময়কর সংবাদ অপেক্ষা করে আছে। ১৯৪১এর ২৬শে জানুয়ারী সহসা জানা গেল যে

সুভাষচন্দ্রকে তাঁর ঘরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমগ্র ভারত বিস্মিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের চমকপ্রদ অন্তর্ধানের সংবাদ শুনল এবং সবাই ভাবতে লাগল তরুণ ভারতের এই প্রিয় নেতা কোথায় গেলেন!

নিরুদ্দেশের পর

সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে সারা ভারতে জল্পনা কল্পনার অন্ত রইল না। সব চেয়ে বেশী বোকা বনে গেলেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। খাঁচার পাখী এমন ভাবে পালাবে তা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সদাজাগ্রত চোখ এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের এই পলায়ন ভারতের ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। পর্বত-মূষিক মারাঠা বীর শিবাজী এমনই করেই অসুস্থতার ভাণ করে একদিন ঔরংজেবের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতকে স্বাধীন করার একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন, একথা সে সময় জানতে না পারায়, দেশবাসীদের মনে নানারূপ সংশয় দেখা দিল। কেউ ভাবল যে সুভাষচন্দ্রের সতত সংগ্রামশীল আপোষ-বিরোধী প্রচেষ্টায় বিব্রত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে কৌশলে কোথাও স্থানান্তরিত করে গোপনে লোক চক্ষুর আড়ালে আবদ্ধ করে রেখেছেন যাতে তিনি যুদ্ধকালে ভারতে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন। আবার কেউবা মনে করলেন যে রাজনৈতিক জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতায় বিরক্ত হয়ে তিনি ধর্ম-জীবনে শান্তিলাভের আশায় হিমালয়ের অজ্ঞাত অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে মূলগত যে ধর্মভাব ছিল তার কথা যাঁরা জানতেন, তাঁদের মনে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হল। তরুণ সুভাষচন্দ্র এই

ধর্মভাবের প্রেরণায় একদিন গৃহত্যাগ করে মাস ছয়েকের জন্যে তীর্থে তীর্থে গুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আবার তাঁর মনে সেই ধর্মভাবের প্রেরণা ফিরে আসায় তিনি গৃহত্যাগ করেছেন—এই ধারণা অনেকের মনে হল। আবার আর একদল লোকের মনে ধারণা হল যে তাঁর মত জন্ম-বিপ্লবী কখনও যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বৃটিশের কারাগারে সময় ক্ষেপ করতে পারেন না বলেই তিনি যে কোন প্রকারে হোক পালিয়ে বিদেশে চলে গেছেন। এঁদের ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর নিরুদ্দেশের পর প্রায় বৎসরকাল তাঁর সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি। এই রহস্যময় নিরুদ্দেশের সম্বন্ধে প্রথম আলোক পাত করেন ভারত গবর্ণ-মেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী ১৯৪১এর ১০ই নভেম্বর তারিখে রাষ্ট্রীয় পরিষদে। তিনি ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র রোম কিংবা বার্লিনে আছেন। পরে পার্লামেণ্টেও অনুরূপ ঘোষণা করা হয়। ১৭ই নবেম্বর অক্ষশক্তির বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে আছেন এবং জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এসব ঘোষণায় দেশবাসীদের মনের সংশয় কিন্তু ঘোচে নি।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে সব মামলা ছিল, ক্রমাগত তার দিন পিছিয়ে যেতে লাগল। গবর্ণমেণ্ট থেকে তাঁর বাড়ী নীলামে বিক্রয় করার চেষ্টা হল কিন্তু ক্রেতার অভাবে নীলাম হল না। দেশবাসীরা সুভাষচন্দ্রকে যে কত ভালবাসেন—এটা তার অন্যতম প্রমাণ। যত দিন যেতে লাগল—সরকার পক্ষও তত তৎপর হয়ে প্রচার কার্যচালাতে লাগল যে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিষ্ট এবং তিনি বিদেশে গিয়ে ফ্যাসিষ্টদের

কাছে আত্ম বিক্রয় করেছেন। বিভিন্ন বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ প্রচার করা হতে লাগল এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ভারতবাসীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এই সব সত্য মিথ্যা সংবাদ ফলাও করে ঘোষণা করা হল। কলিকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক পত্রিকা ষ্টেটস্‌ম্যানে এমন মন্তব্যও করা হল যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট থাকার সময়ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির সংযোগ ছিল এবং তিনি ভারতে পঞ্চম বাহিনী সংগঠনের উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্য পেতেন। ১৯৪২এর ১৯শে মার্চ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী একটি বিবৃতিতে ষ্টেটস্‌ম্যানের এই জঘন্য মিথ্যা উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এই রকম বিভ্রান্তিকর গুজবের মধ্যে সহসা ২৮শে মার্চ তারিখে ফরাসী সূত্র থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদের উপর ভিত্তি করে রয়টার ঘোষণা করলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র নিহত হয়েছেন। এ সংবাদ ভারতবাসীরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডন থেকে একটি ঘোষণায় বলা হল যে আলোচ্য সংবাদটি সমর্থিত নয় এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। পরে জানা গেছে যে এ বিমান দুর্ঘটনার কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ১৯৪২এর এপ্রিল মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স আপোষ প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। তিনিও ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির দেশে আছেন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীদের সামরিক আদালতে বিচারকালে এবং মুক্তি-প্রাপ্ত আজাদী বীরদের মুখ থেকে আজ জার্মানী ও পূর্বএশিয়ায় ভারতের মুক্তি কল্পে সুভাষচন্দ্র যে অভাবিতপূর্ব প্রচেষ্টা,



করেছিলেন, তার বহু কাহিনী আমরা জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি বিদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে তিনি ভারতের বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত করার এক বিরাট প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমরা যথাস্থানে ভারতের এই মুক্তি-যোদ্ধার সামরিক কীর্তি কলাপ বর্ণনার প্রয়াস পাব। সুভাষচন্দ্র কি করে বৃটিশদের সদাজাগ্রত চোখ এড়িয়ে জার্মানীতে যেতে পেরেছিলেন সে কাহিনী এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ও রহস্যাচ্ছন্ন ছিল। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সহকর্মী কারও কাছে তাঁর এই পলায়ন কাহিনী বলেন নি। তিনি কেন দেশ ছেড়ে এসেছেন এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৪৩এর জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বহুদিন ইংরাজদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সেবকরূপে অহিংস সংগ্রামে নিরত থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে বলপ্রয়োগে ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে না পারলে, তারা স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে যাবে না। তাই তিনি বিদেশে এসেছিলেন বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজদের প্রতিপক্ষের সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে। কর্মবীর সুভাষচন্দ্র তাঁর কল্পনা ও অভীপ্সাকে বাস্তবে রূপায়িত করে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। আজ সমগ্র বিশ্ব তাঁর কীর্তির বহর দেখে স্তম্ভিত। আরও যত দিন যাবে, ততই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে নতুন নতুন কীর্তি কাহিনী প্রকাশিত হয়ে জগতকে স্তম্ভিত করে দেবে।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র কেন দেশ ছেড়ে গেছেন তাঁর অধীন সৈন্য ও সেনানীদের সেকথা জানালেও, তিনি কিভাবে দেশ ছেড়ে

গেছেন, সেকথা কাউকে কোনদিন জানান নি। আজাদ হিন্দ ফৌজের একাধিক সৈন্য ও সেনানী এ প্রশ্ন তাঁকে করায় তিনি সংক্ষেপে তাঁদের জানিয়েছিলেন যে সেকথা তিনি বলবেন না, তার কারন যে উপায়ে তিনি একদা ভারত ত্যাগ করে এসেছিলেন, সেই উপায় তাঁকে আবার অবলম্বন করতে হতে পারে। সম্প্রতি কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই রোমাঞ্চকর পলায়ন কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ যিনি করেছেন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত উত্তম চাঁদ। ইনি কাবুলে ব্যবসায় করতেন এবং নিরুদ্দিষ্ট সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করে যখন আফগান রাজধানী কাবুলে গিয়ে পৌছান, তখন ইনি তাঁকে ৪৩ দিন নিজের গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন ও ইটালীর দূতাবাসের মারফং তাঁর বার্লিনে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রথমে উত্তম চাঁদ সম্বন্ধে দুইচারটি কথা বলে, পরে এই রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করছি। শ্রীযুক্ত উত্তম চাঁদ সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে, আজ লক্ষপতি থেকে তিনি পথের ফকির হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়—রাজকারাগারে তাঁর উপর অত্যাচারও কম চলে নি। এক সময় তিনি নিজে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নওজোয়ান ভারত সভার সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁর দুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। পরে তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং পেশোয়ারে তাঁর ব্যবসায়ের একটি শাখা-প্রতিষ্ঠান থাকলেও তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে। এই কাবুলেই ১৯৪১-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি পলায়িত বিপদগ্রস্ত

সুভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর অক্ষশক্তির দেশে যাবার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বসু বার্লিনে পৌঁছানোর কিছুদিন পরেই উত্তম চাঁদের কার্যকলাপ বৃটিশদের গোচরীভূত হয় এবং তাঁরা তাঁর শাস্তিবিধানের জন্যে আফগান গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিতে থাকেন। শক্তি-হীন আফগান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শক্তিশালী বৃটিশদের চাপ সহ্য করা কঠিন। তাই তাঁরা উত্তম-চাঁদকে আফগানিস্থান থেকে নির্বাসিত করেই খুসী হন না—তাঁরা তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এনে বৃটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেন। ১৯৪২-এর ১লা জুন তিনি বৃটিশদের হাতে বন্দী হন এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি নির্জন কক্ষে তাঁকে আটক করে রাখা হয়। এইখানে বসে বসেই তিনি সুভাষচন্দ্রের পলায়ন কাহিনী রচনা করেন। সম্প্রতি এই কাহিনী প্রচারিত হয়ে জনসমাজে একটি অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে।

নেতাজীর আশ্রয়দাতা এই উত্তম চাঁদ আজ সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতেই অবস্থান করছেন। তাঁর দুর্দশার কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন: "কাবুলে আফগান গবর্ণমেণ্টের হাতে বন্দী হবার কিছু পরেই আমাকে ভারতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আমি কাবুলে যে সম্পত্তি ছেড়ে এসেছিলাম, তা ফিরে পাবার জন্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে বহু আবেদন করেছিলাম। ১৯৪৫-এর ৩রা জানুয়ারী আমি ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি পত্রে জানতে পারি যে ১৯৪৩-এর ১৬ই ডিসেম্বর আফগান গবর্ণমেণ্ট আমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করেছেন। আমার সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা

কিন্তু বিক্রীত মূল্য দেখা যায় মাত্র ১২ হাজার টাকা। প্রকৃতপক্ষে অস্থাবর সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ নীলামে চড়ানো হয়েছিল—আর বিক্রীত মূল্যে দেখা যায় যে প্রতিটি বস্তু হাস্যকর ধরণের কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া, বিনা কারণে কয়েক প্রকারের ব্যবসায়ের মাল বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়েছে। আমি গণনার বৈষম্য এবং বিক্রয়-মূল্যের অন্যান্য ত্রুটি দেখিয়ে একটা স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি কিংবা নীলামের বিক্রয়-মূল্যও আমাকে দেওয়া হয় নি। আমাকে কাবুল থেকে তাড়িয়ে দেবার পূর্বে সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার কোন সুযোগ বা সময় আমাকে দেওয়া হয় নি।

"আমার হিসাব বই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি আফগান গবর্ণমেণ্টের কাছে আছে বলেই আমার কাবুল এবং পেশোয়ারের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আফগানিস্থানে যাদের কাছে টাকা পাই, সে টাকা সংগ্রহ করার উপায়ও আমার নেই। আর্থিক দিক থেকে আমার সম্পূর্ণ সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

নেতাজীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে দেশপ্রেমিক উত্তম চাঁদ এমনই ভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর এই আত্মত্যাগের কথা দেশবাসীরা কখনও ভুলবে না। উত্তমচাঁদের বর্ণিত কাহিনীতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ কাহিনী প্রকাশিত হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন ১৪ই জানুয়ারী এবং তাঁর এ গৃহত্যাগ সুপরিকল্পিত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি আফগানিস্থানের পথে রাশিয়ায় পৌঁছুবেন এবং রাশিয়ার

আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধের সুযোগে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও কাজের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতাকে এগিয়ে দেবেন। ১৫ই জানুয়ারী রাত্রিবেলা ট্রেণে মৌলবীর বেশে তিনি পেশোয়ারের পথে রওনা হন। মৌলবী সাজার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় দেড় মাস ধরে সযত্নে গোঁফ দাড়ি বাড়তে দিয়েছিলেন। তিনি পেশোয়ারে দুদিন ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর আফগানিস্থান যাবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পর তিনি ১৯শে জানুয়ারী হাঁটা পথে পেশোয়ার ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে দুজন সশস্ত্র আফগান দেহরক্ষী ছিল আর ছিল রহমৎ খাঁ-রূপী ভগৎরাম। সুভাষচন্দ্র নিজেও পাঠানের বেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নাম নিয়েছিলেন জিয়াউদ্দিন। তাঁরা প্রথমে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে একটি উপজাতীয় সর্দারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে দেহরক্ষী পাঠান দুজন ফিরে যায় এবং জিয়াউদ্দিন ও রহমৎ খাঁ উপজাতীয় সর্দারের ছাড়পত্র নিয়ে তীর্থযাত্রার নামে আফগানিস্থান রওনা হন। পথে বরফ, শীত ও পার্বত্য অঞ্চলের বন্ধুরতার জন্যে তাঁরা খুবই কষ্ট পান। প্রায় দুদিন দুঃখকষ্টের পর তাঁরা কোন রকমে কাবুলে এসে পৌঁছেন এবং একটা জঘন্য সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল যে আফগানিস্থানস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে নিজের পরিচয় দিলে, রাষ্ট্রদূত তাঁর মস্কো পৌছানোর সকল ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাবুলে পৌছে তাঁদের প্রথম কাজ হল রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু আফগান পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সোভিয়েট দূতাবাসে প্রবেশ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। একদিন পথিমধ্যে রহমৎ খাঁ রুশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ী থামিয়ে তাঁকে কাবুলে ভারতের জাতীয়

নেতা সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতির কথা বলল এবং তাঁর মস্কো যাবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল। কিন্তু রুশ রাষ্ট্রদূত অজুহাত দিলেন যে তিনি সুভাষচন্দ্রকে চেনেন না—কাজেই কিভাবে তাঁকে সাহায্য করবেন? হতাশ হয়ে তাঁরা আফগানিস্থানের জার্মান ও ইটালীয় দূতাবাসের খোঁজ নিতে লাগলেন। এমনই করে তাঁদের কয়েকদিন কেটে গেল। এদিকে ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের পলায়নের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে এবং তাঁকে ধরার জন্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁদের বিপদের আশঙ্কা। তার উপর যে সরাইয়ে তাঁরা থাকতেন, সেখানে একটি দুষ্টবুদ্ধি আফগান গোয়েন্দা তাঁদের পিছু নিয়েছিল। সে এঁদের তীর্থযাত্রায় যাবার জন্যে তাগাদা দিত এবং সেই সুযোগে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে ঘুষ আদায় করত। এই গোয়েন্দার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই রহমৎ খাঁ কাবুলের ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের খোঁজে যায়। রহমৎ খাঁ-রূপী ভগৎরাম এক সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নওজোয়ান ভারত-সভার কর্মী ছিল এবং উত্তমচাঁদ ছিলেন সম্পাদক। সেই সূত্রে ভগৎরাম কাবুলে উত্তমচাঁদের ব্যবসায়ের কথা জানত। রহমৎ খাঁ উত্তমচাঁদের দোকান খুঁজে বের করে তাঁর কাছে সুভাষচন্দ্রের কাবুলে উপস্থিতি এবং সরাইয়ে তাঁদের পিছনে আফগান গোয়েন্দা লাগার কথা বলল। উত্তমচাঁদ তখন নিজের গৃহে জিয়াউদ্দিনরূপী সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন। ১৯৪১ এর ৩রা ফেব্রুয়ারী জিয়াউদ্দিন ও রহমৎ খাঁ উত্তমচাঁদের গৃহে গিয়ে উঠলেন।

রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে হতাশ হয়ে সুভাষচন্দ্র ইটালীয় দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন এবং সহজেই সে সংযোগ স্থাপন

সম্ভব হল। ইটালীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সিনোর কারোনি ও তাঁর স্ত্রী সুভাষচন্দ্রকে রোম কিংবা বার্লিনে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করলেন। সেই মর্মে তাঁরা রোম ও বার্লিনে সংবাদও পাঠালেন। একদিক থেকে সুভাষচন্দ্র নিশ্চিন্ত হলেও তাঁর রোম কিংবা বার্লিনে যাবার উৎসাহ ছিল না। তাঁর বরাবর ইচ্ছা ছিল রাশিয়া যাবার। তাই পেশোয়ার থেকে যাঁরা তাকে কাবুলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা রুশ দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কিনা জানার জন্যে পেশোয়ারে খবর পাঠানো হল। এদিকে সংবাদের প্রত্যাশায় কাবুলে বসে থাকাও নিরাপদ নয়। যত শীঘ্র তিনি ওদেশ থেকে বেরুতে পারেন ততই মঙ্গল। তাই অন্য উপায়ও চিন্তা করা হতে লাগল। উত্তমচাঁদের বর্ণিত কাহিনী থেকে দেখা যায় যে সুভাষচন্দ্রের অক্ষশক্তির প্রতি আদৌ কোন প্রীতির মনোভাব ছিল না। বরং তাঁকে বার্লিনে কিংবা রোমে যেতে হবে এ সম্ভাবনাকেই যেন তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। কাবুলস্থিত একজন জার্মান ব্যবসায়ীর মারফৎ ইটালীয় দূতাবাসের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান চলতে লাগল। সিনোর কারোনি যত শীঘ্র ব্যবস্থা করতে পারবেন ভেবেছিলেন, তা পারলেন না। তখন রোম কিংবা বার্লিনে যেতে হলে, মস্কোর পথে যেতে হত। বোধ হয় ছাড়পত্রের ব্যাপার নিয়ে রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ফলেই বিলম্ব হচ্ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানী ও ইটালীর মৈত্রীচুক্তি তখনও বলবৎ থাকলেও, এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি খুব বেশী ছিল না। যত বিলম্ব হচ্ছিল, সুভাষচন্দ্রও ততই অধীর হয়ে উঠেছিলেন। রুশ রাষ্ট্রদূতের হাতে

দেবার জন্যে তিনি একখানা চিঠি লিখে উত্তমচাঁদকে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে রাশিয়ার সরকারী মনোভাব কি তাই জানাই ছিল, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উত্তমচাঁদ কোন ক্রমেই সে চিঠি রুশ দূতাবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

এদিকে উত্তমচাঁদ সুভাষচন্দ্রের মস্কো যাবার আগ্রহ দেখে অন্য পথের চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি 'এম্' নামক একটি লোককে জানতেন। এই লোকটি এক সময় আফগান-রুশ সীমান্তের অধিবাসী ছিল এবং একটি লোককে হত্যা করে সে আফগানিস্থানে এসে পালিয়ে ছিল। আফগানিস্থান ও রাশিয়ার মধ্যে যে হ্যাঙ্গো নদী প্রবাহিত, তার তীর পর্যন্ত তাঁর যাতায়াত ছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে লুকিয়ে যারা চোরাকারবার চালায় এরূপ অনেক লোকের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। উত্তমচাঁদ সুভাষচন্দ্রের নাম না জানিয়ে এরই কাছে জানতে চাইলেন যে কোন লোক যদি গোপনে আফগান-সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ায় যেতে চায়, তবে টাকার বিনিময়ে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে কি না। সে বলল নিশ্চয়ই পারবে। তার সঙ্গে ৭০০ আফগানী টাকায় রফা হল। তবে উত্তমচাঁদ তাকে জানালেন যে যিনি যাবেন, তিনি এখনও এসে পৌছান নি। এসে পৌছুলেই তাকে খবর দেওয়া হবে। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে উত্তমচাঁদ সুভাষচন্দ্রকে 'এম্' এর কথা বললেন এবং তিনিও এ পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্রের ভাব দেখে উত্তমচাঁদ একটা জিনিষ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর বার্লিন কিংবা রোমে যাবার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না—ইচ্ছা ছিল মস্কো যাবার।

কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে রোম-বার্লিন এক্সিসের সহায়তা নিতে হয়েছিল। তিনি কাবুল ত্যাগের সময় উত্তমচাঁদকে এমন কথাও বলে গিয়েছিলেন যে বার্লিন যাবার পথে মস্কোতে তাঁর পক্ষে থেকে যাওয়া যদি সম্ভবও না হয়, তবে তিনি বার্লিনে পৌঁছে সেখানকার রুশ দূতাবাসের মারফৎ একবার মস্কো যাবার চেষ্টা করবেনই। চেষ্টা তিনি হয়ত করেও ছিলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। একথা ভুললে চলবে না যে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ এর মার্চ মাসের শেষে বার্লিন পৌঁছান এবং ১৯৪১ এর ২২শে জুন রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

'এম্' এর সঙ্গে আফগান সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যবস্থা যখন প্রায় ঠিক ঠাক, এমন সময় ইটালীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সিনোর কারোনির চিঠিতে জানা গেল যে সুভাষচন্দ্রের বার্লিন যাবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে এবং তাঁকে নেবার জন্যে রোম থেকে লোক এসেছে। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ইটালীয়দের সহায়তায় আফগানিস্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করলেন। তার কারণ 'এম' এর সঙ্গে গেলে রুশসীমান্তে পৌঁছানোর পূর্বেই বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে। তার পর রাশিয়ায় পৌঁছে রুশদের হাতেও বন্দী জীবন যাপনের সম্ভাবনা আছে। এ দুটি বিপদের কোনটিকেই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করতে রাজী ছিলেন না। কয়েকদিন পরে ইটালীয়দের তরফ থেকে তাঁর ফটো নেওয়া হল। ১৯৪১এর ১৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র ক্যারাটিন নাম গ্রহণ করে দুজন জার্মাণ ও একজন ইটালীয়ের সঙ্গে মোটরে আফগান সীমান্তের দিকে রওনা হলেন। তারপর রুশভূমিতে পদার্পণ করে ২০শে মার্চ সুভাষচন্দ্র ট্রেনযোগে মস্কো রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে

যে জার্মাণরা ছিলেন তাঁরা তাঁকে সোজা বার্লিন নিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র ১৮শে মার্চ বার্লিন পৌঁছান। কাবুল ত্যাগ করার মাস তিনেক পরে সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে কাবুলে এক জার্মাণ ভদ্রমহিলার কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে উত্তমচাঁদের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে লেখা ছিল: "উত্তমচাঁদ নমস্তে। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন সে জন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আমি সারা জীবনে সে কথা ভুলব না।—জিয়াউদ্দিন।"

স্বাধীনতার সৈনিক

১৯৪১ এর মার্চ মাসে জার্মাণীতে পদার্পণ করার পর থেকে সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। স্বাধীনতার এই বীর সৈনিক মাথার উপর বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বসে থাকার জন্যে স্বদেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে যান নি—এ কথা সহজেই ধরে নেওয়া চলে। তিনি গেছিলেন বৃটেনের শত্রুদের সাহায্য নিয়ে কিভাবে নিজের দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদ করবেন—সেই চেষ্টায়। কিন্তু তখন জার্মাণী কার্যত রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড ছাড়া সমগ্র ইউরোপ বিজয়ী হলেও, ভারতের সীমান্ত থেকে যুদ্ধ তখনও অনেক দূরে। জার্মাণী ও ইতালীতে ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে সুভাষচন্দ্রের প্রয়াস আজ কিছু কিছু জানা গেলেও তার অনেক কিছু আজও অজানা আছে। ব্রহ্ম সীমান্তে তাঁর কার্যকলাপের ইতিহাস সমস্ত না জানা গেলেও অনেক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেছে। সে তুলনায় তাঁর ইউরোপ-প্রবাসী জীবনের কার্যকলাপ প্রায় অজ্ঞাত বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪৩ এর মাঝামাঝি সাবমেরিণ সহযোগে ব্রহ্মাঞ্চলে পদার্পণের পূর্ব পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর কাল হিটলারের জার্মাণীতে সসম্মানে ছিলেন। এই কর্মবীর যে এ সময়টা নিশ্চিন্ত আরামে বসে কাটান নি—এটা ধরে নেওয়া চলে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের দিক থেকে ১৯৪১ সালটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি সুভাষ-চন্দ্রের রাশিয়ায় যাবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি জার্মাণীতে

পৌঁছিলে তাঁর মত প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় জননেতাকে জার্মাণ রাষ্ট্রনায়ক হিটলার সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিলেন—একথা বোধ হয় সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের মত জননেতাকে বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যে ব্যবহার না করে তাঁকে রুশদের হাতে ছেড়ে দেবার অভিপ্রায় জার্মাণ কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হবার কোনই কারণ নেই। তা ছাড়া সুভাষচন্দ্রের বার্লিন পৌঁছানোর মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ১৯৪১ এর ২২শে জুন জার্মাণী অকস্মাৎ রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য ও বিপুল সমরোপকরণ নিয়ে ১০০০ মাইল রণাঙ্গনে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসল। অতএব এর পর সুভাষচন্দ্রের রাশিয়ায় যাবার সকল আশা নির্মূল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের সে তীব্রতা ও ভয়াবহতা কল্পনারও অতীত।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পরেই প্রাচ্যে বিশ্বযুদ্ধ আবার একটি উল্লেখযোগ্য মোড় ঘুরল। ১৯৪১ এর ৭ই ডিসেম্বর সুদূর প্রাচ্যে জাপান অকস্মাৎ আমেরিকার পার্লহার্বারে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একসঙ্গে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বান করল। মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান যে বিজয়-সাফল্য অর্জন করল, তার তুলনা ইতিহাসে মেলে কিনা সন্দেহ। জাপানী বাহিনী যুগপৎ অভিযানে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চল থেকে যেমন মার্কিন শক্তির উচ্ছেদ করল, তেমনই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্ম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের অধিকার থেকে নিল কেড়ে। জাপবাহিনী ভারতব্রহ্ম সীমান্তে এসে দাঁড়াল থমকে। জাপবাহিনী ইংরেজবিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

বাঙ্গলার রাজনৈতিক জীবনেও দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের দলপতি সুভাষচন্দ্রের প্রিয় মেজদাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে গ্রেপ্তার হলেন। সরকার পক্ষ থেকে জানানো হল যে জাপানীদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বসুর যোগাযোগ আছে বলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। জনসাধারণ বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে সরকারপক্ষের অভিযোগ শুনল, কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রতিবাদের ধ্বনি মুখর হয়ে উঠলেও, বাইরে তার প্রকাশ হল না। না হবার কারণ যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা বিধানে জনগণের কণ্ঠ তখন অবরুদ্ধ। সরকারী বিজ্ঞপ্তির ধাঁচ দেখে জনগণের মনে একথা জাগল যে ভারতমাতাকে বৈদেশিক শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্যে সুভাষচন্দ্র হয়ত বা জাপানেই গেছেন। এরপর এল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ১৯৪২ সাল। এই সালের মার্চ মাসে রেঙ্গুণ জাপানীদের করতলগত হল। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুণের পতনে কলিকাতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যে কোন মুহূর্তে কলকাতায় বোমা পড়তে পারে—এই ভয়ে নাগরিকরা কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে লাগল সুদূর মফঃস্বলে। জাপানের অস্বাভাবিক অগ্রগতিতে স্বয়ং বৃটিশ প্রভুরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন যে এ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ভারতের পূর্ণ সমর্থন তাঁরা পান নি। কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলে, ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিয়ে সমান অংশীদাররূপে গ্রহণ করলে, কংগ্রেস বৃটিশদের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরেই প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করে-

ছিলেন। ফলে দুই একটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল ছাড়া অধিকাংশ প্রদেশেই চলছিল ৯৩ ধারার শাসন। সমগ্র ভারতে তখন রাজনৈতিক অচল অবস্থা। এই রকম দুর্দশায় পড়ে ১৯৪২ এর এপ্রিল মাসে এলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। তার পূর্বে মার্চ মাসেই নাকি রোম রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে এসেছেন এবং ফুয়েরার কর্তৃক রাজোচিত অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত হয়েছেন। তাঁকে সামরিকভাবে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদা নিয়ে তিনি বার্লিনেই আছেন। এর পরের পরেই বার্লিন রেডিও থেকেও একটা অনুরূপ ঘোষণা করা হয়েছিল বলে প্রকাশ। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র বার্লিন রেডিও থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বার্লিন রেডিও থেকে ইতিপূর্বে আর কখনও কোন বিদেশীকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেওয়া হয় নি বলে বেতার-ঘোষক জানিয়েছিলেন। অনেক ভারতবাসীই হয়ত সুভাষচন্দ্রের এই বেতার-বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন ভারতরক্ষা বিধানাবলীর দ্বারা সমগ্র ভারত আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল বলেই তাঁর বেতার বক্তৃতা নিয়ে খুব বেশী আলাপ আলোচনা হয় নি—জনসমাজে শুধু কাণাঘুসো চলত। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে সেই চিরদিনের সংগ্রামের বাণী। তিনি দেশবাসীদের ইংরেজের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ রক্ষা না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—তাদের উৎসাহিত করেছিলেন সংগ্রাম চালানোর জন্যে। বৃটিশদের

সঙ্গে আপোষরফায় ভারতের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

সুভাষচন্দ্রের এই বিরুদ্ধ প্রচারকার্যের জবাব স্বরূপই যেন এল ১৯৪২ এর এপ্রিল মাসে ক্রীপ্‌স প্রস্তাব। দিল্লীতে ১৭ দিন ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর কিভাবে সে প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, দেশবাসীদের কাছে তা সুবিদিত। এই সময় সুভাষচন্দ্র বার্লিন রেডিও থেকে দ্বিতীয় বেতার-বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সে বক্তৃতায় ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের পরিপূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জার্মাণীতে তখন সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে মনে হয় যে ক্রীপ্‌স প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাইতে যখন তার সংগ্রামের বাণী ঘোষণা করেন, তখন সুভাষচন্দ্রও জার্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে ব্যস্ত ছিলেন। ৯ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন এবং সারা ভারত তার প্রতিবাদে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এর পূর্বে জুলাই মাসে আফ্রিকায় লিবিয়ার যুদ্ধে জার্মাণ ফিল্ড মার্শাল রোমেল অপরিসীম বীরত্ব দেখিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন। তাঁর হাতে বহু ভারতীয় সৈন্যও ধরা পড়েছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করতে সুভাষচন্দ্র কালবিলম্ব করলেন না। তিনি ধৃত ভারতীয় বন্দীদের মনে নিজের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুললেন। বন্দীরা অনেকে স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলেন। জার্মাণীতে গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা

কত ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত—কারও মতে ৭ হাজার, আবার কারও মতে বা ৪ হাজার। ১৯৪৩ সালের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র যখন জার্মাণী ত্যাগ করে সাবমেরিণ যোগে প্রাচ্য রণাঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে একই সাবমেরিণে এসেছিলেন তাঁর পার্সন্যাল সেক্রেটারী মেজর আবিদ হাসান। সম্প্রতি তিনি এবং নেতাজীর ষ্টাফ অফিসার মেজর এন. জি. স্বামী ভারতে এসে পৌঁছেচেন। মেজর হাসানের বিবৃতিতে প্রকাশ যে জার্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ হাজার। উত্তর আফ্রিকায় ধৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা ছাড়া জার্মাণী প্রবাসী ভারতীয়রাও এই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। মেজর হাসান আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের পূর্বে জার্মাণীতে ছাত্র ছিলেন এবং মেজর স্বামী একটি জার্মান ফার্মে কাজ করতেন। পূর্বেই বলেছি যে হিটলার গবর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধির সম্মান দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল, তখন সে বাহিনীর পদমর্যাদাও হল মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর অনুরূপ। এই বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব সৈন্যের বিবৃতিতে প্রকাশ যে শুধু হিটলার এবং অন্যান্য উচ্চ জার্মান রাজপুরুষরা নন, সমগ্র জার্মান জাতিই নেতাজীকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীও তাদের কাছে যথোচিত সম্ভ্রম পেত। ড্রেসডেনে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষা-শিবির ছিল বলে প্রকাশ। সেখানে সুভাষচন্দ্রের সর্বাধিনায়কত্বে জার্মাণ সেনাপতিরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে উচ্চতর রণকৌশল শিক্ষা দিতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজস্ব বেতারকেন্দ্র ছিল এবং সৈন্যদের সুখ সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদের

সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত ছিল। এই মুক্ত সৈনিকটির বিবৃতিতে প্রকাশ যে হিটলার সুভাষচন্দ্রের ব্যবহারের জন্যে ড্রেসডেনে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বার্লিনেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। তাঁর ব্যবহারের জন্যে জার্মাণ ড্রাইভার-পরিচালিত একটি বিশেষ মোটরেরও ব্যবস্থা ছিল। সুভাষচন্দ্রের মোটরে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান থাকত। এই আজাদ হিন্দ ফৌজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে জানা যায় যে রুশ রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সৈন্য প্রেরণের অনুমতি সুভাষচন্দ্র দেন নি।

শুধু জার্মাণীতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। নেতাজীর স্বদেশ-প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইটালীতেও ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি জাতীয় বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল। এই বাহিনী সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল—এদের ইটালীতে শিক্ষা দিয়ে ভারতব্রহ্ম সীমান্ত বা অন্যত্র—ইঙ্গমার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করা। জার্মাণীতে অবস্থান করার সময় সুভাষচন্দ্র একাধিকবার ইটালী পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানে জনগণ ও ইটালী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যথোচিত সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন—এ সংবাদও আজ জানা গেছে। কোচিন ষ্টেটের মিঃ অ্যাণ্টনি এলেন্‌জিমিট্টাম নামক এক ভদ্রলোক ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ইটালীতে ছিলেন। তিনি Inside Italy নামক একটি প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন: "মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে রোমে আসতেন এবং সংবাদ-পত্রাদিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব, ভাবধারা এবং কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ

প্রকাশিত হত। আদর্শবাদের দিক থেকে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিজ্‌ম এবং নাৎসীবাদ থেকে বহু দূরে থাকলেও বহু ইটালীয় তাঁকে সহজ বিশ্বাসে ভারতীয় ফ্যাসিষ্ট নেতা বলে মনে করত। রাজনীতি-সচেতন এবং জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে যে স্বপ্ন—মাতৃভূমির সেই স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পোষিত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যে সুভাষচন্দ্র জার্মাণী ও ইটালীর কাছ থেকে, পরে জাপানের কাছ থেকেও, যা কিছু সাহায্য পেতেন, তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতেন। অনেক ইটালীয় মনে করত যে তিনি বাস্তববাদী এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা বেশী বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে গান্ধীজীর শান্তিবাদে কিংবা পণ্ডিত নেহেরুর আদর্শবাদে বিশ্বাস করত না। ফ্যাসিষ্ট ইটালী ছিল মর্মে মর্মে ম্যাকিয়াভেলীর অনুগামী —কাজেই সমস্ত ভারতীয় নেতার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকেই তাদের নিকটতম বলে মনে হত। যুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে ভারতবন্ধু সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচার কার্য এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তর এগুলোকে ব্যবহার করত। সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি সম্বন্ধে কড়া সামরিক গোপনতা বজায় রেখে চলা হত। সময় সময় তিনি কোথায় আছেন, সংবাদপত্রাদিতে তার বিবরণ বেরুতো এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণও প্রকাশিত হত! জার্মাণীর সামরিক বিপর্যয় ঘটতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে, সুভাষচন্দ্রের নামও পিছনে পড়ে যেতে লাগল। এর পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অধি-নায়করূপে ব্রহ্মে তাঁর পুনরাবির্ভাব দেখা গেল। ১৯৪১ সালে অনেক

ইটালীয় মনে করত যে সুভাষচন্দ্র ভারতের ডুচে বা ফুয়েরার হবেন এবং শক্তিশালী সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মারফৎ ভারতের বহুবিধ সাম্প্রদায়িক, সামাজিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাধির অবসান ঘটাবেন। তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদা বেড়েই চলেছিল; তাঁর যশোভাগ্য কখনও ভাঁটা পড়ে নি। অক্ষশক্তির গভর্ণমেণ্টগুলি তাঁর স্বাধীন চিত্ততার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং ভাল ভাবেই জানতেন যে তিনি কখনও ফ্যাসিষ্ট এবং নাৎসীদের হাতে অস্ত্র কিংবা পুতুল বিশেষ হবেন না।" ইউরোপে জার্মাণী এবং ইটালীর সঙ্গে আচরণে সুভাষচন্দ্র যেমন তাঁর স্বাধীনচিত্ততা বরাবর বজায় রেখেছিলেন, পরে জাপানের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেও এই স্বাধীনচিত্ততা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ভ্রূকুটি দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে বিবেক-বিরুদ্ধ কোন কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, জার্মান গবর্ণমেণ্ট, ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট, কিংবা জাপান গবর্ণমেণ্টের কেউ তা করতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের বিশেষত্ব এইখানে।

যাই হোক, এবার ইটালীতে জাতীয় বাহিনী গঠনের কথা সমাপ্ত করি। ইটালীতে যে জাতীয় বাহিনী গঠিত হয়েছিল, সে বাহিনী কোন রণাঙ্গণে পাঠাবার পূর্বেই ইটালীর সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং ইটালীস্থিত জাতীয় বাহিনীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। ইটালীয়রা চাইল ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর প্রভুত্ব করতে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি জানিয়ে জাতীয় বাহিনী ভেঙ্গে দিলেন। ফলে সৈন্যরা পুনরায় ইটালীয়দের হাতে বন্দী হল। লিবিয়ার যুদ্ধে যে অনেক ভারতীয় সৈন্য ধরা পড়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে সৈন্য

নিয়ে এই জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে মিঃ ইকবাল সইদাই এবং মিঃ নিরঞ্জন সিং বন্দীদের শিবিরে শিবিরে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছিলেন। সৈন্যরা দাবী করল যে ভারতের জন্যে ছাড়া অন্য কারও জন্যে তারা যুদ্ধ করবে না। একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ সইদাই তাদের ভরসা দিলেনঃ "তোমাদের রণাঙ্গণ হবে ভারত সীমান্তে, লিবিয়ায় নয়।" এই ভরসায় সন্তুষ্ট হয়ে তখনই দুই হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিল। এমনই ভাবে ইটালীতে জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি হল। স্বেচ্ছা-সৈনিকদের অন্যান্য বন্দী-সৈন্যদের নিকট থেকে সরিয়ে নেওয়া হল এবং তাদের ইটালীতে পাঠান হল। ইটালীতে শিক্ষাশিবির স্থাপন করে তাদের সামরিক বিদ্যায় নিপুণতর করে তোলার প্রয়াস পাওয়া হল। প্রায় ১০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত প্রথম একটি দল জাতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে এই সংকল্প গ্রহণ করলঃ "ময় তেরেঙ্গে কো সাক্ষী দে কর প্রতিজ্ঞা করতা হুঁকি ভারতমাতাকো আজাদ করনে কি লিয়ে আংরেজোঁ অউর আমেরিক্যানো কে বিরুধ্ তন মন ধন সে লড়ুঙ্গা।" ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই প্রথম দলকে উচ্চতর সামরিক শিক্ষার জন্যে পাঠানো হল রোমে। সেখানে ইটালীয় অফিসাররা বিভিন্ন বিষয়ে এদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে কতিপয় ভারতীয় সৈন্যকে প্যারাশুটেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই স্বেচ্ছাসৈনিকরা শিক্ষা-শিবিরে থাকার সময় একজন ইটালীয় মেজর কোম্পানী কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে আদেশ করলেন যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের লিবিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। লিবিয়ায় তখন জার্মাণ

ও ইটালীয় সৈন্যদের বিপদ সুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হল এবং এই সমিতি ঘোষণা করল যে নিজেদের নেতা ছাড়া, অন্য কারও আদেশে তারা এক পাও নড়বে না। কিন্তু ইটালীয় কর্তৃপক্ষ শিবিরে জাতীয় বাহিনীর সংগঠয়িতা মিঃ সইদাই-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ফলে ভারতীয় সৈন্যরা ইটালীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করল এবং ইটালীয়দের হাতে পুনরায় বন্দী হল। ইটালীর জাতীয় বাহিনীর এই হল পরিণতি।

এদিকে ১৯৪২ সালের শেষ দিকে রুশ-রণাঙ্গনে ষ্টালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে হিটলারের জার্মাণ বাহিনীর বিপর্যয় সুরু হল। জার্মাণী নিজের যুদ্ধ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজকে যথোচিত সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র ক্রমশ পশ্চাতের পটভূমিকায় পড়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশোদ্ধারের ব্রত তখনও অসমাপ্ত। তা ছাড়া সুভাষচন্দ্র একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে জার্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করে কোন দিন তাঁর পক্ষে হয়ত ভারত সীমান্তে পৌছানো সম্ভব হবে না। অথচ ওদিকে ভারতব্রহ্ম সীমান্তে জাপানী বাহিনী ছিল দাঁড়িয়ে। মালয় ও ব্রহ্মে সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সহযোগিতায় ক্যাপটেন মোহন সিং গড়ে তুলেছিলেন একটি জাতীয় বাহিনী। মালয় ও ব্রহ্মের স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন টোকিওবাসী বীর বাঙ্গালী বিপ্লবী শ্রীরাসবিহারী বসু। সুভাষচন্দ্রের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রহ্ম

রণাঙ্গনে উপস্থিত হবার। তা ছাড়া রাসবিহারী বসুর নিকট থেকেও তিনি একাধিকবার আহ্বান পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় ১৯৪৩ সালের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন যে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবেন। একমাত্র সাবমেরিণ ছাড়া, এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধকালে সাবমেরিণ ভ্রমণ যে কত বিপজ্জনক তা না বললেও চলে। কিন্তু দেশের উদ্ধার কামনায় তিনি এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে পথের বিপদকে তিনি পরোয়া করলেন না।

অবশেষে সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী জার্মাণ ও জাপানী গবর্ণমেণ্টের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যাবার জন্যে একটি বিশেষ সাবমেরিণের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে সুভাষচন্দ্রের পার্সন্যাল সেক্রেটারী যে মেজর হাসানের কথা উল্লেখ করেছি, তিনি এই সাবমেরিণে ছিলেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ১৯৪৩ এর প্রথম দিকে তাঁরা এই সাবমেরিণ যোগে যাত্রা করেন এবং প্রায় তিন মাস সমুদ্রবক্ষে যাপন করে জুলাই মাসে সর্বপ্রথম সুমাত্রার একটি বন্দরে পদার্পণ করেন। তারপর সেখান থেকে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে টোকিও যান। এই দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণের সময় অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে এই সাবমেরিণটি একবার ভীষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিল। অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন এক স্থানে সাবমেরিণটি ভুল ক্রমে জলের উপর ভেসে উঠেছিল। ঐ সময় শত্রুপক্ষের একখানি ভাসমান রণতরীর দৃষ্টি পড়ে সাবমেরিণটির উপর। রণতরীখানি সবেগে সাবমেরিণটিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু রণতরীখানি পৌছানোর পূর্বেই সাবমেরিণটি অতল জলে পুনরায় ডুবে যায়। এইভাবে সুভাষচন্দ্র প্রায়

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। ভারত মহাসমুদ্রের বুকে তারা আর কোন বিপদের সম্মুখীন হন নি। এইভাবে সুভাষচন্দ্র জার্মাণী থেকে এলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এইবার তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হল। সুভাষচন্দ্র জার্মাণী ত্যাগ করলেও জার্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে যায় নি। জার্মাণ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এ বাহিনী অটুট ছিল। জার্মাণীর আত্মসমর্পণের পর এ বাহিনীর কতকাংশ ধরা পড়েছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর হাতে। অপরাংশকে পূর্ব রণাঙ্গনে চলে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ। সেখানে তারা রুশবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আজ পর্যন্ত জার্মাণ আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সৈন্য ও সেনানায়কের কোন হদিস পাওয়া যায় নি। যখন এদের হদিস পাওয়া যাবে, তখন জার্মাণীতে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট

সুভাষচন্দ্র জার্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন করেছিলেন মাত্র। অনুকূল পরিপার্শ্ব এবং যথোচিত সহায়ক ও সমর্থক পেলে এই আজাদ হিন্দ ফৌজ যে কি দুর্ধর্ষ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তা তিনি দেখালেন ব্রহ্ম ও মালয়ে বিরাট আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করে এবং আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে। তাঁর মধ্যে যে বিরাট সংগঠনী প্রতিভা লুকিয়ে ছিল অনুকূল ক্ষেত্র পেয়ে তার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পেলাম। ১৯৪৩ এর মধ্য ভাগ থেকে সুরু করে ১৯৪৫ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দুই বৎসর ব্রহ্ম রণাঙ্গনে সুভাষচন্দ্রের কার্য কলাপ ভারত গবর্ণমেণ্ট সুকৌশলে চেপে রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র যে ব্রহ্ম রণাঙ্গণে এসেছেন,এ সংবাদ ভারতবাসীরা জানত এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা কাণা ঘুসো চলত। কিন্তু তিনি যে এত বড় একটা বিরাট সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা ছিল আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। নয়া দিল্লীতে ১৯৪৫এর ৫ই নবেম্বর লাল কেল্লায় মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, কর্ণেল পি, কে, সায়গল ও লেঃ কর্ণেল ধীলন নামক আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীত্রয়ের সামরিক আদালতে যখন বিচার সুরু হয়, তখন ৺ভুলাভাই দেশাইর নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে এঁদের পক্ষ সমর্থন করা হয়। সাড়া দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বীর বাহিনীর সম্বন্ধে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এঁদের বিচার প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু অমর কীর্তিকলাপ আজ

ভারতবাসীরা জানবার সুযোগ পেয়েছে। এই বিচার উপলক্ষে ভারতের জাগ্রত জনসমাজে আজাদী বীরদের প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা গেছে, ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সম্মিলিত ভারতবাসীরা দাবী জানিয়েছে যে এই বীরদের মুক্তি চাই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিমত নিয়েও জানা গিয়েছিল যে আজাদী বীরদের বিচার তাদেরও কাম্য নয়। সম্মিলিত জাতীয় দাবীর সম্মুখে বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন সামরিক আদালতের বিচারে মুক্তি পেয়ে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের কাছে সুবিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন। এঁদের বিচার প্রসঙ্গে দিল্লীতে লাল কেল্লায় এ সত্যও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ সাম্রাজ্যবাদী জাপানীদের হাতে আদৌ ক্রীড়নক বিশেষ ছিল, না। এই আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্টের সেনাদল, যাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট ও নিজস্ব রণকৌশল ছিল। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট জাপান সহ নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। একটা আধুনিক সভ্য ও স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করতে গেলে যা কিছু দরকার, তার কোনটারই অভাব ছিল না এই গবর্ণমেণ্টের। সর্বোপরি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্ব যার কাছে জাপান পর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হত। বহু ক্ষেত্রে জাপানীদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ বাধত। নেতাজী এই সব সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না এবং বেশীর ভাগ

ক্ষেত্রে এই সব মতবিরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর মতই প্রাধান্য বিস্তার করত।

যাক, আপাতত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের কথা পরে আলোচনার জন্যে রেখে, যে পরিস্থিতির মধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মাণী থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এসে সমগ্র ভারতীয় সমাজের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চালালেন, তার কথা আলোচনা করা যাক। যে মালয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তার অবস্থাটা প্রথমে বিশ্লেষণ করা যাক। ভারতবর্ষের মত ব্রহ্ম এবং মালয়ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মবাসী, চীনা এবং মালয়বাসী ছাড়াও পূর্ব এশিয়ায় নানা কাজে রত প্রায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর বাস। তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের লোকই আছে। ভারতের মত এই সব অঞ্চলেও বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ একই ধরণে বিদ্যমান বলে প্রবাসী ভারতীয় সমাজে স্বাভাবিক ভাবে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবল। ভারতের মত সেখানেও বৃটিশদের অত্যাচারের সীমা নেই। ১৯৪১ এর ডিসেম্বর মাসে জাপান বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মাত্র দুমাসের মধ্যে সমগ্র মালয় জাপানীদের করতলগত হল। যে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ছিল মালয়ের শাসক তারা যথাসময়ে নিজেদের স্ত্রীপুত্র এবং সঞ্চিত অর্থাদি নিয়ে সরে পড়ল। মালয়-প্রবাসী ভারতীয়দের যথাসময়ে সরে পড়ার সুযোগ পাওয়াত দূরের কথা, যথাসময়ে তাদের দুঃসংবাদ পর্যন্ত জানানো হলনা। পিছনে ফেলে রেখে এল অসহায়

ভারতীয় সৈন্যদের যেন জাপানীদের হাতে বন্দী হবার জন্যেই। যে সামরিক আদালতে শাহ নওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে আসামী পক্ষের সাক্ষীরূপে ক্যাপ্টেন আরসাদের বিবৃতিতে প্রকাশ যে মালয়ে ভারতীয় সৈন্যদের জাপানীদের হাতে আত্মসমর্পণের সময়, সেনানায়ক কর্ণেল হাণ্ট বলেছিলেনঃ "এখন তোমরা যুদ্ধ-বন্দী এবং আমি তোমাদের জাপানী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছি।" পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সমাজে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রবল বলেই তারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একান্ত অনুরক্ত। সাম্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে জাপানীরা বৃটিশদের চেয়ে কমত নয়ই—বরং বেশী চালাক! তারা মালয় দখল করেই বুঝতে পারল যে ভারতীয়দের মনে দেশের স্বাধীনতা লাভের একটা তীব্র আকাঙ্খা আছে এবং বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব আছে। তারা এই মনোভাবের সুযোগ নেবার সংকল্প করল। তারা ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দী ও নাগরিকদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করল না—বরং তাদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। জাপানী কর্তৃপক্ষের হাতে যেসব ভারতীয় বন্দী ছিল, তাদেরও তারা ছেড়ে দিল। এই ভাবে তারা ভারতীয় সমাজের সহানুভূতি অর্জন করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে সচেষ্ট হতে বলল।

স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সমাজ এতে সাড়া দিল। তবে যারা এতকাল ধরে পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে ক্রীড়নক হবার ইচ্ছা তাদের ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জাপানীদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল

করা—অর্থাৎ বৃটিশ শক্তির হাত থেকে ভারত ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে ভারতবাসীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। অপর পক্ষে জাপানের ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণভাবে তার অনুগত একটি জাপ-তাঁবেদার ভারতীয় বাহিনী সংগঠন। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আজাদ হিন্দ্ গবর্ণমেণ্ট কখনও জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মায় নি। ঘটনাচক্রে পড়ে নিজেদের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করার জন্যে জাপানীদের সাহায্য তাদের নিতে হয়েছে কিন্তু সে সাহায্যের যথোচিত মূল্যও তারা দিয়েছে। তাই দিল্লীর সামরিক আদালতে শাহ্ নওয়াজ প্রভৃতির বিচার-প্রসঙ্গে সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ নাগ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন: "ভারতের মুক্তির জন্যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য। সাময়িক গবর্ণমেণ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের জীবন, সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা।" শেষোক্ত উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ভারতীয়দের জাপানের বিরোধিতাও করতে হত। জাপানের সঙ্গে এ বিরোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন ইউরোপের জার্মাণীতে অনুরূপ প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। মাঝে মাঝে বেতার-যোগে তাঁর উৎসাহোদ্দীপক স্বদেশ—প্রেমের জ্বালাময়ী বাণীও ভারতীয়দের মনে প্রেরণা জোগাতো। তাই ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানের টোকিওতে সুবিখ্যাত বাঙালী বিপ্লবী জাপান-প্রবাসী শ্রীরাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি প্রতিনিধি-সম্মেলন বসল। পূর্ব

এশিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলনে এই বাঙালী বিপ্লবীর অসামান্য দানের মর্যাদা আজও আমরা দিতে পারি নি। সুভাষচন্দ্রের পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিতির পর তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে শ্রীরাসবিহারী বসু ডুবে গেছিলেন বটে—কিন্তু সুভাষচন্দ্র আসার পূর্বে ভারতীয় সমাজে স্বদেশ-প্রেমের জাগরণ তিনিই এনেছিলেন। দুঃখের বিষয় কিছুকাল পূর্বে টোকিওতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যাই হোক, টোকিওর প্রতিনিধি সম্মেলনে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও এ সম্মেলন ভারতীয়দের ঠিক মনঃপূত হয় নি। তারা চাইল আরও বিস্তৃত ভিত্তিতে প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করতে। টোকিওতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (Indian Independence League) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন সম্বন্ধে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল হবে এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। টোকিও সম্মেলনের মাস তিনেক পরে ১৯৪২এর জুন মাসে ব্যাংককে শ্রীরাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বৃহত্তর পরিধিতে অপর একটি প্রতিনিধি সম্মেলন হল। জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সাংহাই, হংকং, ইন্দোচীন, নানকিং, ব্রহ্ম, শ্যাম, আন্দামান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় প্রভৃতি বহু স্থান থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে অখণ্ড ভারত, সাম্প্রদায়িকতার দোষ-মুক্ত জাতীয়তাবাদ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ পালন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত নেতাদের নিয়ে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়ঃ সভাপতি শ্রীরাসবিহারী বসু ; সদস্য চতুষ্টয়ঃ এন্, রাঘবান,

কেশব মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং ক্যাপ্টেন গিলানী। মোহন সিং এর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের ভার দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে নব গঠিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রতি জাপানীদের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করার দাবীও জানানো হয়।

এরকম স্বাধীন মনোভাব এবং স্বাধীন দাবীদাওয়া সাম্রাজ্যবাদী জাপানীদের কানে ভাল না শোনানোই স্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করতে গিয়ে মালয়-প্রবাসী ভারতীয় সমাজ এবং বৃটিশদের পরিত্যক্ত ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সাড়া পেলেন। তিনি নিজে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীরই উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মালয় ও ব্রহ্মের সর্বত্র আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হতে লাগল। ভারতীয়দের এই স্বনির্ভর স্বাধীন প্রচেষ্টা দেখে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ গেলেন ঘাবড়িয়ে। তাঁরা এই আন্দোলনকে নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন। ১৯৪২-এর শেষ ভাগে জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ চরমে উঠল। ব্রহ্মে ভারতীয়দের প্রতি জাপানীদের আচরণ এবং সলোমন্স দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ নিয়ে যে বিরোধ বাধল, জাপানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার যথোচিত উত্তর না পাওয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকরী পরিষদের সদস্য চতুষ্টয় পদত্যাগ করলেন এবং জাপানীরা নিজেদের প্রয়োজনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ব্যবহার করতে চায় জেনে— মোহন সিং ফৌজ ভেঙে দিলেন। এ হল ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। জাপানীরা সঙ্গে সঙ্গে মোহন সিং, কেশব মেনন এবং অন্যান্য

কতিপয় ভারতীয়কে কারারুদ্ধ করল। একা রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ভাঙা আসর জমিয়ে রাখার প্রয়াস পেলেন। কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হলেও জন-সমাজে পূর্বের মত সাড়া আর জাগল না। এই দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরেই পূর্ব এশিয়ার ঘটনাকেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি বিরাট ব্যক্তিত্ববান সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবে পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নতুন প্রাণ ও নতুন আশার সঞ্চার হল। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষও সুভাষচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও জলন্ত স্বদেশপ্রেমের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্রের মত একজন প্রতিষ্ঠাবান বিপ্লবী কংগ্রেস-নেতার আবির্ভাবে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় নতুন প্রাণ ও প্রেরণার সৃষ্টি হল।

১৯৪৩ এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র কিভাবে সাবমেরিণ যোগে বার্লিন থেকে সুমাত্রার একটি বন্দরে পৌঁছেছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি সেখান থেকে সরাসরি টোকিও যাত্রা করেন। তাঁর টোকিও যাত্রার পিছনে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় টোকিওতে তিনি কি করেছিলেন, না, করেছিলেন, তার কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে পূর্ব এশিয়ায় তাঁর ভাবী পরিকল্পনা সম্বন্ধে জাপ প্রধান মন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে—নিজের কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছিলেন। টোকিও বেতার-কেন্দ্র থেকে তিনি পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "পাখীদের মধ্যে কাক, জীবজন্তুর মধ্যে খেকশিয়াল এবং মানুষের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য-

বাঁদীরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর। এই বৃটিশরাই যদি আমাকে প্রতারিত না করে থাকতে পারে, তবে আমি আপনাদের একথা বলছি যে পৃথিবীর আর কোন শক্তি আমাকে প্রতারিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তা সত্বেও আমি আপনাদের মনের সন্দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। হে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ, আপনাদের আমি হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা রূপ মহৎকার্যের জন্যে পতাকার নীচে সমবেত হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারতবর্ষ একটি মাত্র দেশ—ভারতবাসীরাও একটি মাত্র জাতি। আমাদের একমাত্র পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। আমাদের একমাত্র শত্রু বৃটেন। দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে চলুন এবং লালকেল্লার উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করুন। আমি প্রত্যাশা করি যে আপনারা হিন্দুস্থানের শৌর্য ও বীর্যের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন।" সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত এই জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জনসাধারণের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলল—একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য।

টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র ২রা জুলাই তারিখে ফিরে এলেন সিঙ্গাপুরে (বৃটিশদের কবল-মুক্ত করে জাপানীরা প্রাচ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটির নতুন নামকরণ করেছিল শোনান)। ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের জীবনে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেল। এই দিন সুসজ্জিত ক্যাথে বিল্ডিং-এর এক বিরাট জন-সভায় সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। ক্যাথে বিল্ডিং-এ প্রবেশের জন্যে সেদিন জনগণের কি বিপুল উৎসাহ! জানা গিয়েছে যে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক একটি আসন সংগ্রহের জন্যে সেদিন একলক্ষ টাকা দিয়ে-



ছিলেন। ভারতের রহস্যময় জননেতা সুভাষচন্দ্রকে দেখার জন্যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লক্ষ লক্ষ নর নারী ক্যাথে বিল্ডিং-এর বাইরে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। উপস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের সুভাষচন্দ্র সেদিনের সভায় বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক রূপেই শ্রীরাসবিহারী বসুর হাত থেকে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কংগ্রেস যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে নিরত বাইরে থেকে সেই সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই হবে তাঁর কাজ। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে ভারতীয় মাত্রকেই তিনি এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানালেন। সেদিন তিনি আরও ইঙ্গিত দিলেন যে শীঘ্রই আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পুনর্গঠিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে সাময়িক স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট বা আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টও গড়ে তোলা হবে। মিত্র দেশের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা ছাড়া পূর্বএশিয়ার ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে জাপানীদের আর কোন যোগাযোগ থাকবে না। এমন কি ভারত আক্রমণেও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীই প্রধান অংশ গ্রহণ করবে, জাপানীরা সহায়তা করবে মাত্র। সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয়দের সম্বোধন করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "তোমরা ঐতিহ্যগত দিক থেকে বীর ভারতীয়দের পুত্র এবং কন্যা। তোমরা আর ক্রীতদাস নও। আমি চাই তোমরা সমুন্নত শিরে বিচরণ কর। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজীর প্রতি যথোচিত সম্মান দেখিয়েও আমি বলছি যে শক্তি দিয়ে শক্তির জবাব দিতে হবে। ভীরুর মত ক্রীতদাসের

জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। আমরা যদি এক লক্ষ জীবন বলি দিতে পারি। তবে ভারতে বৃটিশদের ক্রীতদাসত্ব থেকে আমরা আমাদের ৪০ কোটি ভ্রাতা ভগ্নীকে মুক্ত করতে পারি।" এইদিন থেকেই পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের গোড়াপত্তন হল। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'দিল্লী চলো,' 'দিল্লী চলো,' 'রক্ত চাই আরও রক্ত চাই।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক-দের তিনি জানালেন: "তুম হামকো খুন দো, মঁয় তুমকো আজাদী দ্যুঙ্গা।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র কাজে হাত দিলেন। ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে নতুন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হল। মালয়ের ভারতীয় জন-সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। সৈন্য, অর্থ ও সামরিক অন্যান্য উপাদান নিজে থেকেই আসা সুরু করল। ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ উপলক্ষে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ব্রতী সেনাদলকে লক্ষ্য করে সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রসঙ্গত তাঁদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—কর্তব্য বিবিধ। অস্ত্রবলের দ্বারা এবং নিজেদের শোনিতৎসর্গ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তারপর ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন স্বাধীন ভারতের জন্যে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে তোমরাই। তখন কর্তব্য হবে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। তোমরা আমাদের দেশরক্ষার শক্তি এমন অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করবে যেন আর কোনদিন আমরা স্বাধীনতা না হারাই। সৈনিক

হিসাবে তোমাদের তিনটি আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। বিশ্বস্ততা, কর্তব্যপালন এবং আত্মত্যাগ—এই তিনটি হবে তোমাদের আদর্শ। যেসব সৈনিক জাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, যারা কোন অবস্থাতেই কর্তব্য পালনে বিমুখ হয় না, যারা আত্মত্যাগের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত তারা হয় অজেয়।" আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি নেতাজীর এ উপদেশ যে ব্যর্থ হয় নি তার বহু প্রমাণ এপর্যন্ত আমরা পেয়েছি। যথেষ্ট সামরিক শক্তির অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকতর শক্তিশালী ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীকে পরাজিত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি বটে---কিন্তু তারা আজও নেতাজীর উপদেশবাণী ভোলে নি। বৃটিশ কারাগৃহের অত্যাচার কিংবা বৃটিশ সামরিক আদালতের বিচার তাদের একটুও লক্ষ্য-চ্যুত করতে পারে নি।

এরপর ঘটনা-চক্রের গতি দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলল। সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভা ও সামরিক জ্ঞান দেখে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেল। ১৯৪৩ এর ২৫শে আগষ্ট সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সিপাহী সালার বা সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander) নির্বাচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে এবং সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন। সৈন্য ও সেনানায়কদের উপযুক্ত শিক্ষাবিধানের জন্যে তাঁর নেতৃত্বে মালয়, ব্রহ্ম এবং শ্যামের বহুস্থানে সামরিক শিক্ষা-শিবির গড়ে ওঠে। এই সব শিক্ষা-শিবিরের মধ্যে সিঙ্গাপুর, জোহোর, সেরেম্বার, ইপো, পেনাং, জিত্রা, ব্যাংকক, এবং রেঙ্গুনের শিক্ষাশিবির

গুলো বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সব কেন্দ্রে পুরোপুরি ভারতীয়দের কর্তৃত্বে ভারতীয় অফিসাররাই সর্ব প্রকার শিক্ষাবিধান করতেন। আলোচ্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর প্রত্যেকটি থেকে প্রতি ছয়মাসে ৩৫০০ করে সৈন্য তৈরী করার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্তে এগিয়ে আসতে লাগল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র আর এক অভিনব কীর্তি স্থাপন করলেন। তিনি কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সহায়তায় ঝান্সীর রাণী বাহিনী নামক ভারতীয় নারী বাহিনীর গোড়া পত্তন করলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের দান যে কম নয়—একথা আশাকরি সকলেই স্বীকার করবেন। যথোচিত সমর-বিদ্যায় শিক্ষা পেলে ভারতীয় নারীরা যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও এগিয়ে যেতে পারে—এ বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের ছিল। তাই ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর গোড়াপত্তন। সিঙ্গাপুরে নারীদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্তে একটি শিক্ষা-শিবিরও খোলা হয়েছিল। দলে দলে ভারতীয় নারীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং সমর-ঘটিত বিভিন্ন বিষয়ে তারা যথোচিত কর্ম-কুশলতারও পরিচয় দিয়েছিল। সম্মুখ রণাঙ্গনে এগিয়ে যাবার জন্তেও এ নারীবাহিনীর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তারা একাধিকবার এজন্তে সুভাষচন্দ্রের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়েছিল। এই বাহিনীর অধিনায়িকা কর্ণেল লক্ষ্মী দেশ-প্রেম ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন। এঁর নেত্রীত্বে রণাঙ্গনে নারী বাহিনী যুদ্ধে আহত কিংবা রোগাক্রান্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের সেবায় অপূর্ব আত্মত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়েছিল। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর মত বালক

বালিকাদের দ্বারা গঠিত বাল সেনাদলের ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অপূর্ব সংগঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আত্মঘাতী বালক সেনাদের প্রধান কাজ ছিল শত্রু পক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা। এরা নিজেদের পিঠে মাইন বেঁধে শত্রুর ট্যাঙ্কের জন্যে অপেক্ষা করত। ট্যাঙ্ক এলে তারা তার নীচে শুয়ে পড়ত। মাইনের ক্রিয়ার ফলে ট্যাঙ্ক যেমন ধ্বংস হত, তেমনই এই বীর অভিমন্যুদের শেষ নিঃশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেত। এ ছাড়া সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ দল নামক একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। শত্রুর কবল-মুক্ত অঞ্চলে সামরিক ও বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে হয়েছিল এই দলের সৃষ্টি! এদের জন্যেও ভিন্ন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

তিন চার মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঝাঁসীর রাণী বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করল। এই বার সুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। ২১শে অক্টোবর তারিখটি একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিন সকাল থেকে সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল ময়দানে প্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়েছিল। এদের মধ্যে নানাধর্ম ও জাতির লোক ছিল— আর ছিলেন উচ্চপদস্থ জার্মান, জাপ ও ইটালীয় রাজকর্মচারীবৃন্দ। বহু ঊর্ধ্বে সগৌরবে বিরাজমান ছিল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরখালাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা। প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঝাঁসীর রাণী বাহিনী ও আজাদ হিন্দ দলের চিত্তাকর্ষক কুচকাওয়াজ হল। 'সিপাহী সালার রূপে নেতাজী তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর এই

ঐতিহাসিক দিনে নেতাজী বাহির বিশ্বের কাছে সগৌরবে অস্থায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। স্থির হল যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষে ভারতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা না যাওয়া পর্যন্ত এই গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্তব্য করে যাবেন। নিম্নলিখিত রূপে আজাদ হিন্দ সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সচিব-সঙ্ঘ গঠিত হয় :

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব)
কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন (নারী সংগঠন)
এস্, এ, আয়ার (প্রচার সচিব)
লেঃ কঃ এ, সি, চট্টোপাধ্যায় (অর্থ সচিব।)
লেঃ কঃ আজিজ আহ্মেদ
লেঃ কঃ এন্, এস্, ভগৎ
লেঃ কঃ জে, কে, ভোঁসলে
লেঃ কঃ গুলজারা সিং
লেঃ কঃ এম্, জেড্, কিয়ানী — সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধি
লেঃ কঃ এ, ডি, লোকনাথন্
লেঃ কঃ এ, ডি, রাও
লেঃ কঃ আহ্সান কাদির
লেঃ কঃ শাহ্নয়াজ
এ, এম, সহায় (মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন সেক্রেটারী)
রাস বিহারী বসু (প্রধান উপদেষ্টা)

করিম গণি

দেবনাথ দাস

ডি, এম্, খাঁ

এ, ইয়েলাপ্পা

আই, থিবি

সর্দার ঈশ্বর সিং

এ, এন্, সরকার (আইন উপদেষ্টা)

উপদেষ্টা

এর পরে পরেই আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ বিধিসম্মত উপায়ে ইঙ্গ-মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের দিন সিঙ্গাপুরে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, সেরূপ দৃশ্য কল্পনায়ও আনা যায় না। সেদিন গম্ভীর উদাত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন: "আমি একজন ফকির। ক্ষুধা, অসুবিধা এবং ভীষণ কঠিন যুদ্ধ ছাড়া তোমাদের আর কিছু আমার দেবার নেই। আমাদের জাতীয় পতাকা লাল কেল্লায় ওড়ানোর জন্যে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছবার পূর্বে তোমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। পথ দীর্ঘ এবং কঠিন। আমার সঙ্গে যোগ দিতে আমি কাউকে বাধ্য করছি না। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক ভারতীয়রা নিজেদের কর্তব্য জানে। যাদের সাহস নেই এবং যারা চরম অসুবিধা সহ্য করতে পারবে না, তারা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং আমি তাদের ভরসা দিচ্ছি যে তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হবেনা। কেন না আমি চাই এমন পরীক্ষিত নরনারী যারা ইতিহাস তৈরী করতে পারে।" তাঁর এই বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের মনে এমন

প্রভাব বিস্তার করেছিল যে জাপানীদের হাতে বন্দী বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরা বক্তৃতা-মঞ্চে ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে বসে পড়েছিল এবং স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার আগ্রহ জানিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাদের চোখের সামনে দেশ-প্রেম ও আত্মত্যাগের নতুন পথ খুলে দিয়েছিল।

এর পর আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সমানভাবে এগিয়ে চলল। আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি সরকারী ভাবে স্বীকার ও সমর্থন করেছিল জাপান, জার্মাণী, ইটালী, স্পেন, শ্যাম, ব্রহ্ম, ফিলিপাইন, নানকিং, মাঞ্চুকুও ও আয়র্ল্যাণ্ড্। আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট সংগঠন ও তার কার্যকলাপের যে ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এই গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কোন অপূর্ণতাই ছিল না। কিন্তু প্রথম গবর্ণমেণ্ট গঠনের পর দেখা যায় যে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব কোন রাজ্য নেই। শীঘ্রই তদানীন্তন জাপ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর সৌজন্যে সে অভাবের পরিপূরণ হয়। ১৯৪৩ এর ৫ই ও ৬ই নভেম্বর টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার একটি সম্মেলন বসে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র উক্ত সম্মেলনে দর্শকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি জাপ গবর্ণমেণ্টের আস্থা জ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ তোজো ঘোষণা করেন যে জাপান অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন কর্তৃত্ব আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।. টোকিও থেকে ফেরার পথে সুভাষচন্দ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত

হয়েছিলেন। ১৯৪৩ এর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন। বঙ্গোপসাগরের এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাঙ্গলার দিকে তাকিয়ে তিনি না জানি অন্তরে অন্তরে কত ব্যথাই পেয়েছিলেন। তাঁর মনের সে ব্যাকুলতার ইতিহাস কোনদিন কি জানা যাবে? যাই হোক, সুভাষচন্দ্র অতঃপর লেঃ কর্ণেল লোকনাথনকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

যাঁরা সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপ তাঁবেদার বলে মনে করেন এবং প্রমাণ করার প্রয়াস পান, ইতিহাস তাদের মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু বলবে না। সুভাষচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পরে পরেই জাপান গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করলেন যে পূর্ব এশিয়ায় জাপ অধিকৃত সকল অঞ্চলের সমস্ত ভারতীয়ের উপর একমাত্র তাঁর এবং তাঁর গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। এই কর্তৃত্ব নিয়ে পূর্ব এশিয়ার জাপানী সেনানায়কদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বিরোধ বাধত। সুভাষচন্দ্র এ ব্যাপার নিয়ে খাস টোকিওতে দরবার করেছিলেন এবং জেনারেল তোজোর গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। তবু জাপানী সেনানায়করা তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্ঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত এই সঙ্ঘর্ষ নিবারণের জন্যে জাপানের সরকারী কর্তৃপক্ষ একজন বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনই ভাবে নেতাজী পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় সমাজের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। তাই আজ মালয় ব্রহ্মের ভারতীয় জন-সমাজ নেতাজীর এত অনুরক্ত,

তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল। ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে সুভাষচন্দ্র মালয় ও ব্রহ্ম বাসী ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। ইতিপূর্বে তিনি সামরিক কার্য কলাপের সুবিধার জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে ব্রহ্মে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছিলেন। অবশ্য স্থায়ী প্রধান কেন্দ্র ছিল সিঙ্গাপুরেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীদের কাছ থেকে জানা যায় যে এই সময় তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। এক এক সময় তাঁকে এক যোগে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত শুধু লিখতেও দেখা গেছে। মনের ভিতর কি জলন্ত স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা থাকলে এরূপ পরিশ্রম করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ কিংবা আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকারেই জাপানীদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সুভাষচন্দ্র জাপানীদের উপর নির্ভর করতেন শুধু সমর-সম্ভার সরবরাহের জন্যে। কিন্তু প্রতিটি জিনিসই যথোচিত অর্থমূল্য দিয়ে কিনে নেওয়া হত। কোন কাজের জন্যেই তাঁর টাকার অভাব হত না—মালয়বাসী ও ব্রহ্মবাসী ভারতীয়রা টাকাত দূরের কথা, তাঁর আহ্বানে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। একাধিকবার জনসভায় এমন দৃশ্য দেখা গেছে যে তাঁর গলার ফুলের মালা বহু লক্ষ টাকায় নীলাম বিক্রয় হয়েছে। তিনি যে কত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন—এ তারই সামান্য নিদর্শন মাত্র।

পূর্বেই বলেছি যে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট ছিল সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ। এই গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব একাধিক বেতার-কেন্দ্র ছিল—নিজস্ব পত্র পত্রিকা ছিল। বেতার-কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র বহুবার বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের

মধ্যে ধর্মগত বা দলগত সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মাতৃভূমির মুক্তি বিধানই ছিল এই গবর্ণমেণ্ট ও সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য। তাঁদের আদর্শ ছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেসের মুক্তি-প্রয়াস। তাই গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সৃষ্টি। আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব ষ্টাম্প ছিল—একথাও আজ জানা গিয়েছে। এমন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত গবর্ণমেণ্ট ও সেনাবাহিনীকে যারা জাপ তাঁবেদার বলেন, তাদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? সেনা-বাহিনী ও গবর্ণমেণ্টের প্রতিটি কর্মচারীর বেতনের হার, মাহিনা বৃদ্ধির হার প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট ছিল। এমন কি সামান্য একটি পাচকের চাকুরীরও যথারীতি গ্রেড ছিল। মাত্র অল্প দিনের প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্র যে এমন একটি সুসংবদ্ধ গবর্ণমেণ্ট এবং সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং তা চিরদিনই ইতিহাসের বিস্ময় হয়ে থাকবে। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এর তুলনা মেলা সত্যই দুষ্কর। আজ জানা গেছে যে যুদ্ধের সময় কলকাতার বুকে জাপানীদের বিমান আক্রমণ যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে নি—তার পিছনে ছিল নেতাজীরই প্রয়াস। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল। তাই বেতার মারফৎ তিনি আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে চাউল দিয়ে বাঙ্গলাকে সাহায্য করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এতগুলো নরনারী ও শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করতে না পারলেও, দেশত্যাগী শত্রু সুভাষচন্দ্রের

অযাচিত সাহায্য নিতে সেদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পদমর্যাদায় লেগেছিল।

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা নেতাজীকে কেন শ্রদ্ধা করে এ সম্বন্ধে কুয়ালা লামপুরের শ্রীযুক্ত কে, বি, স্থব্বায়ার একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উধৃত না করে পারলাম না: "পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা আবার তাদের রহস্যময় নেতাজীকে দেখতে পাবার ভরসা রাখে। তিনি কিভাবে বৃটিশ ভারত থেকে পালিয়েছিলেন, কিভাবে বার্লিন থেকে টোকিও গেছিলেন এবং আবার কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ধোঁকা দিয়েছেন—তা আজও রহস্যাচ্ছন্ন। আমাদের নেতাজী না থাকলে বিগত ৪৪ সালে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা ৯০ জনকেই মৃত্যু বরণ করতে হত। তিনি আমাদের জাতীয় অভিবাদন 'জয় হিন্দ' দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি আমাদের 'শুভ স্থখ চৈনকি' নামে নতুন জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছিলেন। ১২ থেকে ১৮ বছরের বালক বালিকাদের নিয়ে গঠিত আমাদের নেতাজীর 'বালক সেনা' যখন জনাকীর্ণ রাজপথ এবং গহন জঙ্গল দিয়ে মার্চ করে যেতো, তখন তাদের দেখলে বিস্ময় লাগত। তারা ছিল ভাবী স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর আদর্শ বিশেষ। সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় শিশুদের 'কাজ খোঁজার' বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত না—তাদের জাতীয় এবং যান্ত্রিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত।"

পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের বিরাট প্রচেষ্টা আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। তাঁর কার্যকলাপের যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি, তাতেই আমাদের তাক লেগে গেছে।

এখনও তাঁর কার্যকলাপের বহুলাংশই আছে অজ্ঞাত এবং অনাবিষ্কৃত। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয় এবং আমি সে দুশ্চেষ্টাও করিনি। পাঠকপাঠিকাদের সামনে আমি নেতাজীর বিরাট প্রচেষ্টার একটা সাধারণ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম মাত্র। এইবার রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যক্ষ সমর প্রচেষ্টার একটা বিবরণ দেব।

সংগ্রাম ও শান্তি

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভালভাবে পুনর্গঠন করার পর মাত্র বৎসর খানেক সময় পেয়েছিলেন ইংরেজ ও মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার। তাঁর সেনাবাহিনী ও সমর-সজ্জা আশানুরূপ না থাকলেও তিনি রণক্ষেত্রে বহুগুণে অধিক শক্তিশালী ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কোন ক্রমেই তা উপেক্ষা করা চলে না। আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিপূর্ণ সামরিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে কত ছিল তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তার কারণ মুক্তিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীদের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে নানারূপ কথা শোনা গেছে। কেউ বলেছেন ৫০ হাজার ও কেউ বলেছেন ৬৫ হাজার—আবার কেউবা বলেছেন পুরোপুরি এক লক্ষ। আমরা পুরোপুরি যদি এক লক্ষও ধরে নিই—তবু এ সংখ্যা ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর সংখ্যার তুলনায় কত নগণ্য! তা'ছাড়া, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রয়োজনানুরূপ সমর-সম্ভার, এরোপ্লেন, ট্রাক প্রভৃতি ছিল না। নেতাজী টাকা দিয়ে জাপানীদের কাছে—এ সব কিনে নিতেন। তবু তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ট্যাংক, বিমান, ট্রাক প্রভৃতি সরবরাহ করতে পারে নি—বা ইচ্ছা করে করে নি। ইচ্ছা করে না করার কারণ, জাপানীরা নেতাজীর উগ্র স্বদেশপ্রেম এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্রবোধকে সহ্য করতে পারত না। তিনি ওদের হাতের পুতুল হননি—এইখানেই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। তাই কার্যত রণক্ষেত্রে জাপানীদের

পূর্ণ সহযোগিতা আজাদ হিন্দ বাহিনী পায় নি। তবু যে আরাকান, কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধে এ বাহিনী নিছক স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় এত বীরত্ব দেখাতে পেরেছিল—সেটাই'ত বিস্ময়কর!

আজাদ হিন্দ বাহিনী মোটামুটি চারটি দল বা ব্রিগেডে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম ছিল গান্ধী ব্রিগেড—সে দলের নেতা ছিলেন কর্ণেল কিয়ানী। দ্বিতীয় দলের নামকরণ হয়েছিল সুভাষ ব্রিগেড্—মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ ছিলেন এই দলের সেনানায়ক। তৃতীয় দলটির নাম ছিল আজাদ ব্রিগেড্—এ দলের অধিনায়ক ছিলেন কর্ণেল মোহন সিং। আর কর্ণেল ধীলনের নেতৃত্বে—যে চতুর্থ ব্রিগেড ছিল—তার নাম ছিল নেহেরু-ব্রিগেড্। সম্মুখ সমরে বীরত্ব ও আত্মত্যাগে এই ব্রিগেড কয়টি যে আদর্শ সৃষ্টি করে গেছে—তার তুলনা খুবই কম মেলে। তা সত্ত্বেও যে এরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে নি —তার জন্যে সৈন্যরা দায়ী নয়—দায়ী জাপানীদের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিরোধিতা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর সম্ভারের অভাব এবং ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয়ের বিপুল সামরিক শক্তি। আজাদ হিন্দ ফৌজ বোধ হয় সর্বপ্রথম আরাকানের পার্বত্য প্রদেশেই লড়াই সুরু করেছিল ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। সুভাষচন্দ্র এই আরাকান যুদ্ধের নামকরণ করেছিলেন "অগ্নি-শুদ্ধি" (Baptism of fire)। আরাকান যুদ্ধে একাধিক ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং তাদের প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তবু আরাকান যুদ্ধকে কোন ক্রমেই আজাদ হিন্দ ফৌজের চরম লক্ষ্য বলে ধরা চলে না। সুভাষচন্দ্র একে একটি পরীক্ষামূলক যুদ্ধ হিসাবেই গ্রহণ

করেছিলেন। আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজের হাতে গ্রহণ করার মাত্র আট মাসের মধ্যেই আরাকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রণাঙ্গণে আজাদ হিন্দ ফৌজ কিরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারে তার প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা হয় আরাকান রণাঙ্গনে। তাই নেতাজী আরাকান যুদ্ধের নামকরণ করেছিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্নি-শুদ্ধি'। ১৯৪৪ এর ৪ঠা জুলাই থেকে ১০ই জুলাই পর্যন্ত নেতাজীর ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নেতাজী সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বৎসরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একাধিক বেতার-বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরাকান যুদ্ধের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন, তা এখানে উধৃত করে দিলাম: "আমাদের সমরোদ্যমের গতি বাড়িয়ে বৃটেন-আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ-ঘোষণাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য ১৯৪৪ এর জানুয়ারী মাস ব্যয়িত হয়েছিল। এরপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আরাকান অঞ্চলে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথমারম্ভ। আরাকান অঞ্চলের যুদ্ধকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্নি-শুদ্ধি বলা চলে। এই পরীক্ষায় আমাদের সৈন্যরা পূর্ণ বিজয়ী হয়ে এসেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যরা যে চরমতম অসুবিধা এবং কঠিন অবস্থার মধ্যেও বীরের মত যুদ্ধ করবে—এ বিষয়ে সকলেই এখন নিঃসংশয়। আরাকান যুদ্ধে আমাদের যেসব সৈন্য ও অফিসার বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের কয়েকজনকে সাময়িক গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সম্মানে বিভূষিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।" অতএব

আরাকান যুদ্ধকে আমরা সম্মুখ রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের বাস্তব মহড়া হিসাবে ধরে নিতে পারি।

আরাকানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সুভাষচন্দ্র এবার ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অভিযান সুরু করার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাটিতে পদার্পণ এবং বন্দীনী ভারত-জননীর শৃঙ্খল মোচন। তাই আরাকান যুদ্ধারম্ভের প্রায় মাস খানেক পরে--আনুমানিক ৮ই মার্চ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের টিড্ডিম অঞ্চলে নতুন অভিযান সুরু করে। ব্রহ্মযুদ্ধে জাপানীরা তখন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম সুরু করেছিল বলে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাহায্য পায়নি। তবু তারা ইঙ্গমার্কিণ সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে মণিপুর ও আসামের দিকে এগিয়ে এল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামে সুরু হল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মণিপুর ও আসামের যুদ্ধে প্রধানত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরাই যে অংশ গ্রহণ করেছিল, সুচতুর ব্রিটিশ সমর-কর্তারা সুকৌশলে সে সত্য দেশবাসীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪৪ এর মার্চ মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করে ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে। তখন তারা মনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছিল—তা সহজেই অনুমেয়। এরূপ স্থির হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এলে এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপস্থিত হলে, সুভাষচন্দ্র তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন। তাই বলে সুভাষচন্দ্র রণাঙ্গণে সৈন্যদের পরিদর্শন করতে আসতেন না, এমন কথা মনে করলে ভুল হবে। সৈন্যরা যখনই কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হত, তখনই

নেতাজী নিজের সমস্ত বিপদ আপদের আশঙ্কা দূরে ঠেলে রেখে ছুটে আসতেন প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে এবং নানাভাবে তাদের সুখ সুবিধা বিধানের চেষ্টা করতেন। তবে প্রধান কর্মক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রয়োজনীয়। তিনি সেখানে থেকে নিত্যনতুন সমর-সম্ভার সংগ্রহ, সৈন্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন।

যাই হোক, ১৯৪৪ এর মার্চ এপ্রিল মাসে ইন্দোব্রহ্ম সীমান্তের টিড্ডিম, কালাদন, হাকা, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বহুগুণে অধিক শক্তিশালী বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। সৈন্যদের মনোবল দেখে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর প্রবল বর্ষা নামায় সৈন্যদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। এক বৎসর পরে 'নেতাজী সপ্তাহ' উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধের আশাপ্রদ চিত্র আঁকলেও, এর মধ্যে একটা নৈরাশ্যের দিকও ছিল। ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল সদস্যই স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল না এবং দেশ ও জাতির প্রতি তাদের আনুগত্যও সমান ছিল না। অপেক্ষাকৃত বেশী ভীরু এবং বিশ্বাসঘাতক একদল সৈন্য মাঝে মাঝে দল ত্যাগ করে বৃটিশ পক্ষে যোগ দিচ্ছিল। এই নির্লজ্জ দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পেয়ে নেতাজী মর্মাহত হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ এই সব দুর্বলতা দূর করে, তাকে আরও সংহত, সুসম্বদ্ধ এবং কর্মনিপুণ করে গড়ে তোলার জন্যে ১৯৪৪ এর ৩০শে অক্টোবর একটি সমর পরিষদ গঠিত হয়। সমর পরিষদে নিম্নোক্ত ১১ জন সদস্য ছিলেন: কর্ণেল ভোঁসলে, কর্ণেল কিয়ানী, লেঃ কঃ আহসান কাদির, লেঃ কঃ আজিজ আহমদ খাঁ,

লেঃ কঃ হবিবুর রহমান, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, শ্রীরাঘবন, এস, এ, আয়ার, শ্রীপরমানন্দ, কর্ণেল এ, সি, চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারী এবং শ্রী এ, ইয়েলাপ্পা সংযোজিত সদস্য।

এই ভাবে ১৯৪৪ এর শেষ দিকে আবার নতুন উদ্যমে যুদ্ধ সুরু হয়। কিন্তু বর্ষার সময় যুদ্ধ স্থগিত রাখার ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর সুবিধা হয়েছিল বেশী। তারা ইন্দোব্রহ্ম রণাঙ্গণে বহু স্থান পুনরধিকার করে নিয়েছিল। পূর্বেই বলেছি যে জাপানীরা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের নীতি অবলম্বন করায় তারা যুদ্ধে তেমন জোর দিচ্ছিল না—শৃঙ্খলার সঙ্গে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করাই ছিল তাদের অবলম্বিত নীতি। এর উপর বহু ক্ষেত্রে তারা আবার নেতাজীর আদেশ লঙ্ঘন করে নিজেদের সামরিক কৌশল দেখাতে গিয়েও নতুন বিপদের সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ডিমাপুর অবরোধের কথা বলা চলে। জানা গেছে যে ডিমাপুর অবরোধ না করে, সরাসরি দখল করাই ছিল নেতাজীর নির্দেশ। কিন্তু জাপানী সেনানায়ক তাঁর নির্দেশ অমান্য করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন এবং ফলে ডিমাপুর দখল করা আর সম্ভব হয়নি। ডিমাপুর আজাদ হিন্দ ফৌজের করতলগত হলে এ যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। তা ছাড়া, ক্রমশঃ যুদ্ধের গতি যতই জাপানীদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছিল, ততই তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছিল। এই অবস্থায় পড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে সীমাবদ্ধ সমরসামর্থ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবে তারা জাপানীদের মত বিনা যুদ্ধে

রণাঙ্গন পরিত্যাগ করত না। তারা পশ্চাদপসরণ করলেও, বিপক্ষের প্রচুর ক্ষতি সাধন করত।

১৯৪৫-এর গোড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবার নতুন করে আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের সন্ধান পাওয়া যায়। নেতাজী একটি বিশেষ নির্দেশনামায় এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণশীল আজাদ হিন্দ ফৌজ ক্রমশই অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে। মিত্রবাহিনী যতই ব্রহ্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে, ততই বৃটিশ-প্রেমিক একদল ব্রহ্মবাসী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তারাও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা করতে থাকে। জাপানী আক্রমণের সম্মুখে মালয় ও সিঙ্গাপুরে বৃটিশরা একদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে যে নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তি ও দায়িত্বহীনতা দেখিয়েছিল, বৃটিশ আক্রমণের সম্মুখে জাপানীরাও শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তেমনি ঔদাসীন্যই দেখিয়েছিল। তখন তাদের তথাকথিত মিত্রতার সকল মুখোসই পড়েছিল খসে। কিন্তু এতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব একটুও ম্লান হয় নি। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে তাদের ছিল শুধু রাইফেল আর বেয়নেট। তাই ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয়ের বিপুল ট্যাঙ্কবহর এবং বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখেও তারা যে বীরত্ব দেখিয়েছিল ইতিহাসে তার তুলনা মেলে কি না সন্দেহ। ইম্ফল ও ডিমাপুর অবরোধের সময়—একদিকে বর্ষা অপর দিকে খাদ্যাভাব এবং ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীররা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে নি। দিনের পর দিন তাদের ঘাস খেয়ে কেটেছে—এমন উদাহরণও বিরল নয়। তবু

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে যারা জীবনপণ করেছিল তারা সহজে শত্রুকে রেহাই দেয় নি—কিংবা তার হাতে আত্মসমর্পণ করে নি।

১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে ব্রহ্ম পুনরাধিকারের জন্যে মিত্রপক্ষ বিপুল রণসজ্জা নিয়ে অভিযান সুরু করল। সেই অভিযানের সম্মুখে জাপানীরা ক্রমশ ব্রহ্ম পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানীদের এই নীতি সমর্থন করতে পারেন নি বলে তাঁর সঙ্গে জাপানী রণনায়কদের প্রায়ই মতবিরোধ হত। ১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করে যায়। সুভাষচন্দ্র তাদের সঙ্গে রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। নেতাজীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী মেজর হাসান (যিনি জার্মানী থেকে তাঁর সঙ্গে একই সাবমেরিণে পূর্ব এশিয়ায় এসেছিলেন) বলেছেন যে তাঁর আদৌ রেঙ্গুণত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। নেতাজীর সামরিক সেক্রেটারী কর্ণেল মেহবুব আহ্‌মদ এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেছেন। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তিনি রেঙ্গুণে থেকে সম্মুখ সমরে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান করে পরাধীন মাতৃভূমির ঋণ শোধ করে যান। তাই প্রবল বিমান আক্রমণের মুখেও তিনি মুহূর্তের জন্যে নিজের বিপদের কথা ভাবতেন না। কিন্তু তাঁর রেঙ্গুণ ত্যাগ নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র নাকি এই সময় মন্তব্য করেছিলেন: "ভারতে বহু মহামানব আছেন। ভারতের প্রয়োজন ঐতিহ্যের—কাজেই আমি অটুট থেকে দেহরক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দান করে যেতে চাই।" কিন্তু অবশেষে সেনানায়করা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে রেঙ্গুণ পরিত্যাগে সম্মত করেন। ১৯৪৫ সালের

২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করে যান। রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পূর্বে তিনি রেঙ্গুণবাসী ভারতীয়রা যাতে বৃটিশদের হাতে বিপদে না পড়তে পারে তার জন্যে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে যান। রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পূর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানায়কদের উদ্দেশ্যে তিনি যে শেষ নির্দেশনামা প্রচার করেছিলেন, নিম্নে তার প্রতিরূপ দেওয়া হল: "১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আপনারা যেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং এখনও চালাচ্ছেন, আজ গভীর বেদনা নিয়ে আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তা প্রথম চেষ্টাই মাত্র। আমাদের আরও বহু চেষ্টা করতে হবে। আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নেব না। ইম্ফলের সমতলভূমিতে, আরাকানের অরণ্যাঞ্চলে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি ও অন্যান্য অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকবে।"

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ

জয় হিন্দ্

(স্বাঃ) সুভাষচন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক

১৯৪৫-এর ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুণ ত্যাগের পর আগষ্ট মাসের

মাঝামাঝি জাপানীদের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ এবং গতিবিধি সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। ১৯৪৫ এর ১৪ই আগষ্ট জাপানীরা সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে। নেতাজী তখন ছিলেন ব্যাঙ্ককে। মেজর হাসানের বিবৃতিতে প্রকাশ যে এর কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্র তাঁর ষ্টাফ নিয়ে এরোপ্লেনযোগে সায়গন যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাপান যাওয়া। তাঁর ষ্টাফে ছিলেন মেজর হাসান, কর্ণেল মেহবুব আহমদ, কর্ণেল হবিবুর রহমান প্রভৃতি। সায়গনে পৌঁছিলে জাপ কর্তৃপক্ষ জানান যে এরোপ্লেনে মাত্র দুজনের জন্যে স্থান পাওয়া যেতে পারে। নেতাজী হবিবুর রহমানকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে টোকিও যাত্রা করেন। এর কয়েকদিন পরে মেজর হাসান প্রমুখ অন্যান্যরা অন্য এরোপ্লেনযোগে টোকিও যাত্রা করেন। পথে হানয় নামক স্থানে তাঁদের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এইখানে তাঁরা ফরমোসা দ্বীপে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পান। ১৯৪৫-এর ২৩শে আগষ্ট জাপ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সরকারীভাবে ফরমোসার তাইহকু বিমান ঘাঁটিতে সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ দেন। বিমান দুর্ঘটনায় স্বাধীন ভারত-গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান—উভয়েরই দেহ পুড়ে গিয়েছিল। নিজের দেহের কথা না ভেবে হবিবুর রহমান নেতাজীকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। পরে নেতাজীকে একটি হাসপাতালে এবং হবিবুর রহমানকে অপর একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র হবিবুর রহমানকে বলেছিলেনঃ "হবিব, আমার দেশবাসীদের বলো যে আমার দেশের

স্বাধীনতার জন্যে আমি প্রাণ দিলাম। অবিলম্বে আমার দেশ স্বাধীনতা লাভ করবে—এই পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই আমি প্রাণত্যাগ করব।” ভারতের রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর মুখের কথাকেই আজ সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চলেছে।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে ভারতবাসীরা আজও নিঃসংশয় নয়। তাঁর মৃত্যু হয়েছে—এর যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তাঁর মৃত্যু হয় নাই—তারও কোন সত্য প্রমাণ নেই। সত্য জানা সম্ভব ছিল একমাত্র হবিবুর রহমানের। কিন্তু হাসপাতাল থেকে আরোগ্য লাভ করে তিনি যখন নেতাজীকে দেখার জন্যে অপর হাসপাতালে যান, তখন ডাক্তারের মুখ থেকে শুনতে পান যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও শেষ হয়েছে। তাই ভারতে আজ তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রচুর দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। এক দল লোক বিশ্বাস করেন—তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অপর দলের ধারণা তিনি মাঞ্চুরিয়া বা অন্যত্র আত্মগোপন করে আছেন—যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনানায়করা শেষোক্ত মতাবলম্বী। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুই হয়ে থাকুক, আর তিনি জীবিতই থাকুন—ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর অমর কীর্তি আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। তবে তিনি বেঁচে থেকে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল মোচন দেখে যান—ভারতবাসী মাত্রেরই অন্তরে এই ব্যাকুল বাসনা।

সুভাষচন্দ্র ব্রহ্ম পরিত্যাগের পর—ক্রমে সমস্ত ব্রহ্ম ইঙ্গ-মার্কিণ সমর-কর্তাদের করতলগত হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানায়করাও বৃটিশদের হাতে ধরা পড়েন। দেশবাসীদের সম্মিলিত

দাবীর চাপে আজ তাঁদের অধিকাংশই মুক্তি পেয়েছেন এবং প্রকৃত স্বাধীনতা সৈনিকের মত তাঁরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সংকল্প জ্ঞাপন করেছেন। সুভাষচন্দ্রই তাঁদের এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নেতাজীর প্রতি তাঁদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অন্ত নেই। সুভাষচন্দ্র তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ দিয়ে এঁদের অন্তরের সব মালিন্য মুছে দিয়ে সেখানে জ্বালিয়ে দিয়েছেন স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিশিখা। হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে তাঁরা সবাই ভুলে গেছেন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি—তাঁরা একজাতি, একপ্রাণ ও একতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন এবং আসমুদ্র হিমাচল নেতাজীর সেই মহান বাণীই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের জাতীয় সঙ্গীত, সমর-সঙ্গীত এবং 'জয় হিন্দ্' আজ ভারতের প্রতি গৃহ মুখর করে তুলেছে। আর নেতাজী ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের বুকের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করা এই ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সামনে দাঁড়িয়ে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদীরা ত্রাসগ্রস্ত হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক মতবাদ

সুভাষচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা বলেছি। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব যে কত স্বতন্ত্র এবং কত বিরাট ছিল—তা যাঁরা তাঁকে না দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গে না মিশেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বব্যাপক—তাঁর মতাবলম্বী অনুচরদের ত কথাই নেই, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধবাদী তাঁরাও তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না করে পারতেন না। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সমপর্যায়ে ফেলা যায়—এমন দ্বিতীয় নেতা যেমন নেই, সুভাষচন্দ্রের সমপর্যায়ে ফেলা যায়—এমন দ্বিতীয় নেতাও নেই। তাই বয়সের দিক থেকে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর পুত্রবৎ হলেও, গান্ধীজী পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রশংসার চোখে দেখতেন। রাজনীতির বিচারে সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা বড় কূটনীতিবিদ রাষ্ট্রনায়ক খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর মত সত্যসন্ধ নির্ভীক ত্যাগব্রতী স্বাধীনতার সৈনিক খুঁজে পাওয়া সত্যই দুষ্কর। আমার এক এক সময় মনে হয় যে সুভাষচন্দ্র যদি পরাধীন ভারতে না জন্মে কোন স্বাধীন দেশে জন্মাতেন, তবে তিনি রাজনীতির কূট খেলা নিয়ে আদৌ নাড়া চাড়া না করে হয়ত প্রতিভাবান সমর-কুশলী রণ-নেতা হতেন, নয়ত হ'তেন সত্যান্বেষী ধর্মোপাসক। রাজনীতির খেলা কূটবুদ্ধির প্রয়োজনে সময় সময় যে বাঁকাচোরা গলি-পথে বিচরণ বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্র তা বুঝতেন না কিংবা বুঝলেও সে পথে চলতে পারতেন না। রাজনীতির

ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেন, তাঁদের কথা ও কাজে সময় সময় প্রচুর ব্যবধান দেখা যায়। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এ দুমুখো নীতির হদিস মেলে না। তিনি কার্যক্ষেত্রে যেমন নির্ভীক ছিলেন, কথায়ও ছিলেন তেমনই স্পষ্টবাদী। এর ফলে তাঁকে যে বিপদে না পড়তে হত, তাও নয়—কিন্তু তাঁর চরিত্রের এমন দৃঢ়তা ছিল যে কোন কিছুই তিনি পরোয়া করতেন না।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ শক্তির উপাসক। তাই শক্তির মন্ত্রই ছিল তাঁর কাছে বড়। ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস রেখে দেশ ও জাতির মুক্তি কামনায় তিনি যে কোন বিপদকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারতেন। তাঁর জীবনের সাধনা ছিল একমুখী। যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছিলেন যে পরাধীন ভারতকে যে কোন উপায়ে শৃঙ্খল-মুক্ত করাই তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবনে আর অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান ছিল না। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যে যৌন প্রেরণা আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাকেও তিনি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবায়। জীবনের প্রথমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একদা কৌমার্যব্রতের আদর্শে জীবন গড়ে তুলেছিলেন। পরে জীবনের গতি ধর্মের দিক থেকে রাজনীতির দিকে মোড় ফিরলেও, তাঁর জীবন যাপনের ধারা বদলায়নি। কিশোর বয়সে কিংবা যৌবনে সুভাষচন্দ্র ভুলেও কোন দিন কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—এমন কথা তাঁর শত্রুও বলতে পারবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব করতে গিয়ে তাঁকে বহু নারীকর্মীর সংস্পর্শেই আসতে হয়েছে। আর তাঁর মত সমুন্নতদেহ

দৃঢ়চরিত্র সুপুরুষ নারীর মনে রেখাপাত করবে এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাঁর দিক থেকে তিনি কোনদিনই নারীদের সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা তাঁকে বিয়ের কথা বললে তিনি স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে জবাব দিতেন যে সে বিষয়ে তাঁর ভাববার সময় নেই। দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত এমন একমুখী জীবন সত্যই বিরল। এ বিষয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ অন্যান্য ভারতীয় নেতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের পার্থক্য লক্ষনীয়। দেশের মুক্তি-সাধনার ফাঁকে ফাঁকে এঁদের জীবনের ও চরিত্রের একটা গার্হস্থ দিক আছে—রাজনীতির মরুভূমিতে আছে সহজ স্বাভাবিক রসবোধের মরুদ্যান। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই শেষোক্ত বস্তুটির অভাব ছিল। তাঁর চরিত্রে একটা প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য ছিল এবং সর্বদা গভীর চিন্তা করতে গভীর স্বরে কথা বলতেই তিনি ভালবাসতেন।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বড় বৈশিষ্ট ছিল এই যে কৈশোরে গুরুর সন্ধানে ব্যর্থকাম হয়ে ধর্মজীবন যাপনের আশা ছেড়ে দিলেও, ধর্মের মূলগত নীতি তাঁর জীবনকে আষ্টে পৃষ্ঠে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল। তিনি ছিলেন নীতিবাদী, ঈশ্বর বিশ্বাসী, মিতাহারী এবং মিতাচারী। একটা সিগারেট পর্যন্ত তাঁকে কেউ কোনদিন খেতে দেখেনি। নিজের অনুচরদের তিনি যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চাইতেন, তাঁর নিজের জীবন ছিল তারই প্রতিফলন। তাঁর চরিত্রের আর একটি বড় গুণ ছিল অনুগামীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি, দায়িত্ব-বোধ এবং কর্তব্যজ্ঞান। তাঁর রাজনৈতিক শিষ্যবৃন্দ থেকে সুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক এ উক্তির সত্যতা

সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন। আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্যের মুখ থেকে একাধিকবার শুনেছি যে নেতাজী একাধারে তাঁদের বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর নিজের চরিত্রে যেমন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না, তেমনই আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্য থেকেও তিনি প্রথম থেকেই এ সঙ্কীর্ণতাকে দূরীভূত করেছিলেন। নিজের পদমর্যাদার জন্যে কোন অহমিকা বোধ তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি নিজে সর্বাধিনায়ক হলেও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে একই খাবার এক সঙ্গে বসে সমভাবে বণ্টন করে খেতে তাঁর কুণ্ঠা হত না। তিনি ইচ্ছা করলে জাপানীদের দেওয়া অনেক সুখ সুবিধা ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু জাপানীরা তার সৈন্যদের জন্যে অনুরূপ সুবিধা দিতে পারবে না বলে, তিনি নিজে সব সুবিধা প্রত্যাখ্যান করতেন। এমন ঘটনার কথাও জানা যায় যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ একটি সৈনিকের গায়ে কোট ছিল না বলে, তিনি অকাতরে তাকে নিজের গায়ের মূল্যবান কোট খুলে দিয়েছিলেন। প্রকৃত সেনানায়কের চরিত্রে যে যে গুণ থাকা দরকার তার সবগুলোই সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে ছিল—তার সঙ্গে ছিল অপূর্ব স্বদেশ-প্রেম এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানব-প্রীতি। তাঁর চরিত্রে এই সব অপূর্ব গুণের সমাবেশ হয়েছিল বলেই তিনি এত অল্প সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীদের মনে এত গভীর রেখাপাত করতে পেরেছিলেন এবং সামান্য দু বৎসরের মধ্যে তাদের আজীবনের শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়ে তাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন দেশাত্মবোধের মহান আদর্শের পথে। তাই তাঁর মানস-সন্তান আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈন্য ও সেনানীরা আজও যখন তাঁদের নেতাজীকে

স্মরণ করেন তখন তাঁরা শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠেন—বহু-দূরবর্তী নেতাজীকে স্মরণ করে তাঁদের চোখে মুখে নেমে আসে আবেগের বর্ণোচ্ছাস !

পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র কোন শ্রেণীতে পড়েন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই নিজের শ্রেণী এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামত বিচার করতে হলে তাঁর মাপকাঠি দিয়েই তা করতে হবে ! গান্ধীজীর মহান ব্যক্তিত্ব এবং জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকলেও, তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদকে নিঃসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পারেননি। পরাধীন দেশে রাজনীতি করতে গিয়ে সাময়িকভাবে গান্ধীবাদের সঙ্গে আপোষ করলেও সে আপোষ বেশী দিন টেকেনি—শীঘ্রই তাঁর স্বমূর্তি প্রকাশ পেয়ে তাঁকে ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কি ছিল ? এখানে সংক্ষেপে এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরম বামপন্থী—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা-অর্জন প্রয়াসী। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর রাজনীতিতে আপোষের স্থান ছিল এবং আছে। প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ এবং প্রয়োজন হলে আপোষ—গান্ধীজী এ দুই পথকেই স্বীকার করেন। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের নাম শুনলেই সুভাষচন্দ্র যেতেন ক্ষেপে। তিনি সংগ্রাম ছাড়া অন্য পথ জানতেন না। সে সংগ্রামের ব্যাপারেও আবার তাঁর কাছে হিংসা এবং অহিংসার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যবধান ছিল না। হিংসা দিয়ে

হিংসাকে জয় করার মধ্যে তিনি গান্ধীজীর মত, কোন নীতিগত বিরোধ দেখতে পেতেন না। প্রথম জীবনে তাঁর উপর আয়র্ল্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরার সিন্ ফিন্ দলের রাজনীতি খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তিনি একবার সিনফিনের আদর্শে সমান্তরাল স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব এনেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সম্মুখে। তাঁর এ পরিকল্পনা অবাস্তব বলে সেদিন জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নাকচ হয়ে গেছিল। তার প্রায় ১৫ বৎসর পরে তিনি স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে প্রমাণ করে গেছেন যে ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকলে সমান্তরাল স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট স্থাপন আদৌ অসম্ভব কিংবা অবাস্তব নয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে আমরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদের বিবর্তন দেখি। তিনি তখন কিষাণ-মজদুর আন্দোলনের দিকে প্রথম মনোনিবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথম শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের ব্যাপক গণ-সংযোগ ঘটিয়েছিলেন।

এর পরই আসে সুভাষচন্দ্রের ইউরোপে নির্বাসন কাল। ইউরোপে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে সমগ্র ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধ-বাদী দুইটি রাজনৈতিক আদর্শের টানাপোড়েনে দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন। একদিকে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ভূভাগ সোভিয়েট রাশিয়ায় চলছে কম্যুনিজমের পরীক্ষা, অপর দিকে ইউরোপের ইটালী ও জার্মাণীতে মুসোলিনি ও হিটলারের আবির্ভাবে দেখা দিয়েছে বিরুদ্ধ-বাদী রাজনৈতিক মতবাদ ফ্যাসিজম্। ইংল্যাণ্ডের তথাকথিত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের 'আদর্শ কোন দিনই সুভাষচন্দ্রের মনে কোন প্রেরণা জোগাতো না। তাঁর

মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—কম্যুনিজ্‌মের দিকে, অথচ তিনি মূলত ধর্মবাদী ছিলেন বলে হুবহু কম্যুনিজ্‌ম গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর দৃষ্টি মৃদু ধরণের সমাজতন্ত্রবাদের উর্ধ্বে কখনও পৌঁছাতে পারে নি। কম্যুনিজ্‌মের কোন কোন দিক তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করলেও, এই নতুন মতবাদের কোন কোন দিক তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি নিজের সংশ্লেষণী ক্ষমতার বলে এই পরস্পর বিরোধী উভয় মতবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট নিয়ে নিজের 'সাম্যবাদ সঙ্ঘে'র আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর The Indian Struggle নামে প্রসিদ্ধ পুস্তকে এই সাম্যবাদ সঙ্ঘের কথা আছে। এই আদর্শে তিনি ভারতে কোন বিশেষ দল অবশ্য তৈরী করতে পারেন নি। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধের পর এবং তাঁর দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি যে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছিলেন, তার মধ্যে কিছু পরিমাণে নিজের আদর্শ প্রতিফলিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কম্যুনিজ্‌ম এবং ফ্যাসিজ্‌মের মূলগত বিরোধ সত্বেও সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে নীচের সাধারণ বৈশিষ্টগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন: উভয় মতবাদেই ষ্টেটকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হয়, উভয় মতবাদই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিরোধী, উভয় মতবাদই মূলত পার্টির শাসনে বিশ্বাস করে, উভয়েই বিশ্বাস করে পার্টির একনায়কত্বে এবং সংখ্যালঘু দল যদি পার্টির বিরোধিতা করে, তবে উভয় মতবাদেই তার দমনের নীতি স্বীকৃত। এর উপর ভিত্তি করে সুভাষচন্দ্র যে মতবাদ তৈরী করেছিলেন তার মূল কথা হল দশটি: (১) ধনিক জমিদারদের স্বার্থের বদলে শ্রমিক কৃষাণদের স্বার্থ হবে বড়। (২) ভারতের পূর্ণ

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন হবে পার্টির মূল লক্ষ্য। (৩) পার্টির আদর্শ হবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, তবে কেন্দ্রের হাতে কয়েক বৎসরের জন্যে ডিক্টেটর সুলভ ক্ষমতা রাখতে হবে। (৪) দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা করতে হবে। (৫) জাতিভেদ প্রভৃতি বৈষম্যের বিলোপ করে নতুন সমাজ সংগঠন করতে হবে। (৬) আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে নতুন মুদ্রামাণ প্রচলিত করতে হবে। (৭) জমিদারী তুলে দিয়ে নতুন ভূমিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (৮) পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের আশ্রয় না নিয়ে দৃঢ় সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। (৯) প্রস্তাবিত পার্টির কাজ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—বিদেশী প্রচার কার্য এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতাকে এগিয়ে আনতে হবে। (১০) এই পার্টির নেতৃত্বে দেশের সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। পুরোপুরি এই সব আদর্শ বজায় রেখে অবশ্য ভারতে সুভাষচন্দ্র কোন দল গড়ে তুলতে পারেন নি। তবে তাঁর এই রাজনৈতিক আদর্শ থেকে তাঁর মনের একটা সুস্পষ্ট চেহারা পাওয়া যায়।

যুদ্ধকালে ভারতের আশু মুক্তির জন্যে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিষ্ট জার্মাণী ও জাপানের সহায়তা নিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ তাঁকে ফ্যাসিষ্ট প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ তিনি আদৌ ফ্যাসিষ্ট ছিলেন না। তবে দেশের মুক্তির জন্যে তিনি ফ্যাসিষ্ট, কম্যুনিষ্ট যে কোন দেশের সাহায্য নিতেই প্রস্তুত ছিলেন। হাতের কাছে ফ্যাসিষ্ট জার্মাণী এবং জাপানকে পেয়েছিলেন বলে এবং তারা তাঁকে সাহায্য

দিয়েছিল বলেই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকে তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তার নজির দেখিয়ে বলতে চান যে স্বাধীন ভারতে এক-নায়কের পদাধিকার করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এর মত ভুলও আর কিছু হতে পারে না। সুভাষচন্দ্র বরাবর নিজেকে স্বাধীনতার সৈনিক বলেই মনে করতেন। তবু যে দেশে থাকতে কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস তিনি পেয়েছিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন যে ক্ষমতা তাঁর হাতে না এলে, তিনি নিজের রাজ-নৈতিক কর্মতালিকা বাস্তবে পরিণত করে ভারতের স্বাধীনতাকে এগিয়ে আনতে পারবেন না। তাই বলে নিছক ক্ষমতাপ্রিয়তার বশে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সে উদ্দেশ্য তাঁর যদি থাকত, তবে ভারতের বাইরে গিয়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে তাঁর আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে গড়ে তুলতেন না। তিনি বরাবর আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে বলেছেন দ্বিতীয় রণাঙ্গণ। তাঁর মতে ভারতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দ্বারা কংগ্রেস যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সুরু করেছিল, বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তিনি তারই শক্তি-বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট একান্ত সাময়িক। ভারতের মুক্তি-যুদ্ধ সাফল্য-মণ্ডিত হলে ভারতবাসীরা নিজেরাই তাদের শাসক-মণ্ডলী নির্বাচন করবে।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। যে মুহূর্তে আপোষের পথ ত্যাগ করে 'ভারত ছাড়ো'

মন্ত্রোচ্চারণ করে গান্ধীজী অন্ধকারে জাতির পথ নির্দেশ করেছিলেন, সেই মুহূর্তে বিদেশস্থিত সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা অন্য কেউ বেশী খুসী হন নি। আজাদ হিন্দ বেতার-কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে যে একাধিক বেতার-বক্তৃতা করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন মেলে। 'নেতাজী সপ্তাহ' উপলক্ষে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে এই বলে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন: "আমাদের জাতির জনক! ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।" মতবিরোধ সত্ত্বেও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার প্রতি তাঁর এই রকম শ্রদ্ধা ছিল। ভারতে আদর্শবাদী রাষ্ট্রনেতা ও কূটনীতিবিদের অভাব নেই। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের মত ত্যাগব্রতী একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক এবং সংগঠন-নিপুণ কর্মী আর একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে বেশ কয়েক বৎসর এগিয়ে দিয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর আঘাতে উঠেছে টলে। আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ আজ অসামরিক জনগণের জীবনকে প্রভাবিত তো করেছেই, অক্টোপাসের মত সে আদর্শ আজ ভারতের নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীতেও তার বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা আজ তাই আপোষ-কামনায় জাতীয়তাবাদী ভারতের দ্বারস্থ। আজ হোক, কাল হোক, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত। জাতীয়তাবাদী ভারতের এই সাফল্যের মূলে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের দান অপরিমেয়। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ও ধ্যান—ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন—আজ বাস্তবে

পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু তিনি আজ কোথায়? স্বাধীন ভারতের সামাজিক রাষ্ট্রিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনকে ভেঙে গড়ার জন্যে সুভাষচন্দ্রের মত সংগঠন প্রতিভা সম্পন্ন নেতার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাঁর প্রিয় জন্মভূমির প্রয়োজনে আমরা আবার তাঁকে পাব কি? পাই আর নাই পাই—একটি বিষয় সুনিশ্চিত। তাঁর আদর্শ যুগ যুগ ধরে শুধু ভারতবাসী নয়—বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতিমাত্রেরই মনে জাগাবে প্রেরণা, বুকে জাগাবে সাহস। পূর্ব এশিয়ায় তিনি যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের সঞ্চার করেছিলেন—তা ধীরে ধীরে পৃথিবীর নির্যাতিত নিপীড়িত পরাধীন সকল দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বমানবতার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সংগ্রামশীল নির্যাতিত মানবের মধ্যে চিরসংগ্রামী নেতাজী যুগ যুগ ধরে মৃত্যুঞ্জয়রূপে বিরাজ করবেন।

জয় হিন্দ্!

[illegible]



নেতাজি